প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো

(ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌,
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়-কর্ত্তৃক
লিখিত ভূমিকাসহ)

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, এম্‌. এ.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্‌ ফেলো এবং
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৩৬

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

Reg. No. 887B, October, 1936—A.

উৎসর্গ

যাঁহার প্রেরণায়, উৎসাহে ও সুযোগদানে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চায়

নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে

সেই বিদ্যোৎসাহী, ধীমান্ ও অক্লান্তকর্ম্মী

ভাইস্-চ্যান্সেলর্

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ.,

বি. এল., বার্.-এট্-ল, মহাশয়কে

অশেষ শ্রদ্ধা- ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে

এই পুস্তিকাখানি

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার অন্তর্গত হরপ্পায় এবং সিন্ধু-প্রদেশের লারকানা জেলায় মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের খননের ফলে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বতন ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, প্রাগ্‌বৈদিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন—তাম্র- ও প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র, ভারতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই সকল বিক্ষিপ্ত সামগ্রী হইতে তত্তৎসভ্যতা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর ছিল না—প্রাগ্‌বৈদিক যুগ আমাদের নিকট কুহেলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় যে আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে এই কুহেলিকা অন্তর্হিত হইয়া ভারতের একটী প্রাচীনতম ও গৌরবময় সভ্যতার স্বরূপ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই আবিষ্কার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

অধুনা 'সিন্ধু-সভ্যতা' এই আখ্যায় মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পার সভ্যতা বর্ণিত হইতেছে। ইহার বিভিন্ন নিদর্শন সিন্ধু-প্রদেশের ও পাঞ্জাব-প্রদেশের অন্যান্য বহুস্থানে, এবং ভারতের

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের কাহিনী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ-কর্ত্তৃক ইংরাজীভাষায় বিস্তারিত গ্রন্থাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ অনায়াস-লভ্য নহে। এই কারণে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সিন্ধু-সভ্যতা-বিষয়ক পুস্তক রচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস-সঙ্কলনে ও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অবহিত থাকিয়া এতাবৎ কাল দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গগত প্রাতঃস্মরণীয় স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সকল বিষয়ে আলোচনার ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা, ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পিতৃদেবের সেই পবিত্রব্রতে ব্রতী হইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়কে নিত্য নব অলঙ্কারে সুশোভিত করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এবং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা কম আশা ও গৌরবের কথা নহে। তাঁহারই উপদেশানুসারে শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, এম. এ., প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো-সম্বন্ধে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে জনশিক্ষার পথ ক্রমশঃ সুগম করিয়া দিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার ভারত গভর্নমেণ্টের বৃত্তি লাভ করিয়া হরপ্পা, মোহেন্-জো-দড়ো ও তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে সুদক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট প্রত্নতত্ত্ব-শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিসার্চ্ ফেলো'-রূপে গবেষণা-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই পুস্তক-প্রণয়নে তিনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন,

এবং ইহাতে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ করিয়া ইহার মূল্য যথাসম্ভব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই জন্য তিনি বাঙ্গালা দেশের পাঠক-সম্প্রদায়ের ধন্যবাদভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যয়-সঙ্কোচের ফলে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগীয় খননকার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাকীর্ত্তি-রক্ষার আইন সংস্কৃত হইয়াছে, এবং তদনুসারে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বাহিরের কর্ম্মীরাও খনন করিবার সুযোগ ও অধিকার পাইতেছেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ-কর্ত্তৃক পরিচালিত School of Indic and Iranic Studies নামক সমিতি এই অবসরে ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স্ লইয়া সিন্ধুপ্রদেশে চান্‌হুদড়ো নামক মৎ-আবিষ্কৃত প্রাচীনস্থানে খননকার্য্যের পুনরারম্ভ করিয়াছেন। এইক্ষণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই কার্য্যে যোগদান করুন এবং প্রাচীন সভ্যতার নব নব নিদর্শন আবিষ্কার-দ্বারা সেই সকল বিস্মৃতযুগের বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের সূত্রগুলি একত্র সংযোজিত করুন। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহিত মিলিত হইলে এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে। এই খনন-কার্য্য অবশ্য বহু ব্যয়সাধ্য; দেশের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করেন এবং এই বিষয়ে অবহিত না হন তাহা হইলে ইহা সম্পন্ন হইবার আশা সুদূরপরাহত। শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থের প্রচার-দ্বারা বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে

ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে পারিবে এবং অনুকূল জনমতের গঠন-দ্বারা আমাদের সেই আশা ফলবতী হইবার পক্ষে সহায়তা করিবে।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম
কলিকাতা
২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১০	১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ	১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ
২৯	২০	এনাও	আনাউ
৩৬	৮	জাতীর	জাতির
৪২	২৫	অনাউ-এর	আনাউ-এর
৪৫	১৩	শীলমোহর	শীলমোহরের
৮৯	২১	Vol. I	M. I. C., Vol II
১০৬	২৪	M. D.	M. I. C.
১১৯	১৩	লছমির	লছ্‌মির
১২০	১৭	লো-বো-ব্য-দী (lo-bo-bya-di)	লো-ব-ব্য-দী (lo-ba-vya-di)
১৫২	১১	অধিবাসীর	অধিবাসীরা

বিজ্ঞপ্তি

সিন্ধু-প্রদেশের লারকানা জেলার মোহেন্-জো-দড়ো ও পাঞ্জাবের মণ্ট্গোমারী জেলার হরপ্পা নামক স্থান-দ্বয়ের ধ্বংসস্তূপ-সমূহ বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ঐ স্তূপ-সমূহ হইতে ভারতীয় এক সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এত দিন পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের সময়কেই (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০) ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম কাল বলিয়া নির্ণয় করিতেন। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার প্রত্ন-সম্পদের আবিষ্কারের ফলে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এক বিশাল সভ্যতা বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই সভ্যতার চিহ্ন সিন্ধুনদের তীরে কিংবা তৎসমীপবর্ত্তী বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য উক্ত সভ্যতাকে "সিন্ধুসভ্যতা" এই আখ্যাও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

মোহেন্-জো-দড়ো-হরপ্পা তথা সিন্ধুসভ্যতার কোন বিবরণ, জনশ্রুতি কিংবা প্রাচীন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ একটী উন্নত সভ্যতার ইতিহাস না থাকা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। উল্লিখিত স্থান-সমূহে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা এখনও দুর্ব্বোধ্য; এই লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল স্থানের প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিবে; তবে তত্রত্য অধিবাসীদের উন্নত প্রণালীর গৃহাদি ও তাহাদের

পরিত্যক্ত সুরুচিসম্পন্ন দ্রব্য সমূহ ঐ যুগের রহস্য যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা তাম্র-প্রস্তর যুগের। এখানে লৌহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ঋগ্বেদেও লৌহের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত 'অয়স্' শব্দ ঐ যুগে তাম্র ও ব্রোঞ্জ্ অর্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কারণ লৌহের প্রচলনের পর অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে লৌহ অর্থে কৃষ্ণায়স্ বা কার্ষ্ণায়স প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সেই জন্য ঋগ্বেদকে আমরা তাম্র-প্রস্তর যুগে রচিত গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতা অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের এবং পৃথক্ জাতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইলেও, এই উভয় সভ্যতাই তাম্র-প্রস্তর যুগে উপজাত হইয়াছিল। সেই জন্য ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থে বর্ণিত সভ্যতার নিদর্শনের সঙ্গে সিন্ধূপত্যকায় লব্ধ উপাদানের তুলনা করিতে স্থানে স্থানে প্রয়াস পাইয়াছি। এই উভয়ের সাদৃশ্য- ও পার্থক্য-দ্বারা বস্তুবিষয়ের উপলব্ধির সহায়তা হইতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

১৯৩০ সালে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বৃত্তিলাভ করিয়া হরপ্পা, মোহেন্-জো-দড়ো, তক্ষশিলা ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে স্যর্ জন্ মার্শাল্, ডাঃ ম্যাকে ও শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত-প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় উক্ত বিভাগে কার্য্য করিবার সুযোগ লাভ করি। কিন্তু গভর্নমেণ্টের অর্থ-সঙ্কটের দরুন ১৯৩২ সালের প্রথম ভাগে বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে গবেষণার জন্য "রিসার্চ ফেলো"-রূপে মনোনীত হই। সেই

সময় বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া মোহেন্-জো-দড়ো-সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে প্রথম প্রেরণা-ও উৎসাহ-লাভ করি। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় এ বিষয়ে পুস্তক-প্রণয়নের কোন কল্পনা আমার ছিল না। একমাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপ্রাণনা ও উপদেশই আমাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছে। তিনি সাহায্য ও সুযোগদান না করিলে এই পুস্তক কখনও হয়ত রচিত ও প্রকাশিত হইত না। সেই জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তক-প্রণয়নে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত স্যর্ জন্ মার্শাল্-সংকলিত 'Mohen-jo-daro and the Indus Civilisation' (M. I. C.) নামক সুবৃহৎ পুস্তক হইতে যথেষ্ট উপাদান আহরণ করিয়াছি। উক্ত গ্রন্থের সংকলয়িতা ও প্রকাশকের নিকট, এবং অন্যান্য যেসকল লেখকের গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য-লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

যিনি বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া আমার এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছিলেন, সেই উদারহৃদয় ডাক্তার পঞ্চানন মিত্র মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া আজ হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এখন মোহেন্-জো-দড়ো-কাহিনী তাঁহাকে পুস্তকাকারে দেখাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম।

Modern Review (December, 1924) পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক লিখিত "Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilisation" নামক প্রবন্ধ হইতে রাখালবাবুর

মোহেন্‌-জো-দড়োতে গমনের বিবরণ প্রভৃতি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। অধিকন্তু উক্ত অধ্যাপক মহাশয় বহুস্থানে এই বইয়ের প্রুফ্‌ দেখিয়া দিয়াছেন, এবং ইহার ভাষা-বিষয়ে বহুস্থানে আমি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল প্রফেসর ডাক্তার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় এই পুস্তকের উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমার কোন কোন বন্ধুর নিকট হইতেও সময় সময় কোন কোন বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহারাও আমার ধন্যবাদার্হ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, অন্যান্য কর্ম্মচারী ও প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ সহানুভূতিতে পুস্তকখানি সত্বর প্রকাশিত হইতে পারিল; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

'ইণ্ডিয়ান্‌ ফটো এন্‌গ্রেভিং কোম্পানী' এই পুস্তকের ছবির ব্লক সুচারুরূপে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১. ১০. ১৯৩৬

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

প্রমাণ-পঞ্জী (BIBLIOGRAPHY)

Annual Reports of the Archæological Survey of India, 1923-24 to 1929-30.

Chatterji, Dr. S. K., "Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilisation," The Modern Review for December, 1924

Childe, V. G., "The Bronze Age." 1930.

Childe, V. G., "Notes on Some Indian and East Iranian Pottery," Ancient Egypt and the East, Parts I and II. 1933.

Child V. G., "New Light on the Most Ancient East." 1934.

Frankfort, H., "The Indus Civilisation and the Near East," Annual Bibliography of Indian Archæology. 1932.

Frankfort, H., "Tell Asmar, Khafaje and Khorsabad," Oriental Institute Communications, Chicago, No. 16. 1933.

Gadd, C. J., "Seals of Ancient Indian Style found at Ur," Proceedings of the British Academy, Vol. XVIII, 1933.

Hargreaves, H., "Excavations in Baluchistan," Memoir No. 35 of the Archæological Survey of India. 1929.

Hunter, G. R., "The Script of Harappa and Mohenjodaro." 1934

Law, N. N., "Mohenjodaro and the Indus Valley Civilisation." The Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, No. 1. 1932.

Mackay, E., "The Indus Civilisation." 1935.

Majumdar, N. G., "Explorations in Sind," Memoir No. 48 of the Archæological Survey of India. 1934.

Marshall, Sir J., "Mohenjodaro and the Indus Civilisation." 1931.

Meriggi, von P., "Zur Indus Schrift," Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Z. D. M. G.). 1934.

Stein, Sir A., "An Archæological Tour in Waziristan and Northern Baluchistan," Memoir No. 37 of the Archæological Survey of India. 1929.

Stein, Sir A., "An Archæological Tour in Gedrosia," Memoir No. 43 of the Archæological Survey of India. 1931.

প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ভারতের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বিশাল সভ্যতার আলোকরশ্মি যে স্থানের ধ্বংসস্তূপ হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, সেই মোহেন্-জো-দড়োর[১] নাম আজকাল না জানেন এরূপ শিক্ষিত ভারতবাসী খুব কমই আছেন। পশ্চিম-ভারতের সিন্ধুদেশের অন্তর্গত লারকানা জেলা ঐ বিভাগের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা উর্ব্বরতায় শ্রেষ্ঠ। ধান্য এস্থানের অন্যতম প্রধান শস্য। রেলগাড়ীতে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পার্শ্বে হেমন্তের মনোরম পীতবর্ণ ধান্যক্ষেত্র পথিকের মনে অলক্ষিতে বাংলাদেশের কথা জাগাইয়া দেয়। মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত লারকানাকেও "সিন্ধুস্থান" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই জেলারই একখণ্ড ঊষর ভূমিতে মোহেন্-জো-দড়ো নগর অবস্থিত। একদিকে সিন্ধুনদের বিশাল বক্ষ এবং অন্যদিকে পশ্চিম নারখাত, এই উভয়ের মধ্যে প্রায়

১ সিন্ধি ভাষায় 'মোহেন্-জো-দড়ো' শব্দের অর্থ "মৃতের স্তূপ" (Mound of the dead)।

২৪০ একর ভূমি ব্যাপিয়া এক দ্বীপতুল্য ভূখণ্ডে মস্তক উন্নত করিয়া মোহেন্-জো-দড়োর অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বিশাল বিধ্বস্ত নগরীতে ২০ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ৭০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ স্তূপ আছে।

ইহা নর্থ্ ওয়েষ্টার্ণ্ রেলওয়ে লাইনের ডোক্‌রী ষ্টেশন হইতে প্রায় ৭ মাইল এবং লারকানা সহর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে (২৭°১৯′ উঃ, ৬৮°৮′ পূঃ) অবস্থিত। এই স্থানের আবহাওয়া অত্যন্ত রুক্ষ। আজকাল বৎসরে মোটামুটি ৬ ইঞ্চির বেশী বারিপাত হয় না। শীতকালে রাত্রে অত্যধিক ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে জল জমাট বাঁধিয়া যায় এবং গাছপালা শাকসব্জি মরিয়া যায়; আবার গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরমে (প্রায় ১২০°) মশামাছির উপদ্রবে জীবনধারণ ক্লেশকর হইয়া উঠে।

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে মোহেন্-জো-দড়ো জগতের এক প্রাচীনতম সভ্যতার গৌরব-মুকুট মাথায় পরিয়া ভারতের পণ্যদ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানি করিত, ভারতের ধ্যান-ধারণা ও শিল্প-বাণিজ্যের বাণী জগতে প্রচার করিত—সভ্য-জগতের ঈর্ষার নগরী—সেই মোহেন্-জো-দড়ো আজ প্রকৃতির অভিশাপগ্রস্ত মরুভূমিতুল্য।

বর্ত্তমান মোহেন্-জো-দড়ো নৈসর্গিক সকল বিষয়ে পূর্ব্ববৎ আছে কি না ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। হয়ত তৎকালে এ স্থানের জলবায়ু অন্যরূপ ছিল; কারণ, যদিও মোহেন্-জো-দড়োর মিস্ত্রীরা কাঁচা ইট এবং পোড়া ইট এই উভয়েরই ব্যবহার জানিত তথাপি বাসগৃহের জন্য পোড়া ইটেরই ব্যবহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। শুধু ভিত্তিস্থাপন এবং শূন্য স্থান পূরণের জন্যই সাধারণতঃ কাঁচা ইটের ব্যবহার হইত। ইহা

হইতে মনে হয় যে তৎকালে অধিকমাত্রায় বারিপাত হইত। এই অনুমানের পক্ষে আরও যুক্তি আছে। এখানে অসংখ্য সারি সারি পয়ঃপ্রণালী (ড্রেন) খননযন্ত্রের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিয়া দিতেছে যে ইহারা তৎকালের মোহেন্-জো-দড়োর বর্ষার জলনিকাশের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ স্থানে প্রাপ্ত মাটীর খেলনা এবং শীলমোহরে ক্ষোদিত বাঘ, হাতী ও গণ্ডার প্রভৃতি আর্দ্রভূমিবাসী জীবজন্তু হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে এখানে বৃষ্টিপাতের মাত্রা নিতান্ত কম ছিল না।

মোহেন্-জো-দড়োতে লব্ধ উপাদানের সাহায্যে সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে প্রচুর পরিমাণে বারিপাত হইত এবং সে স্থানের আবহাওয়া যে আর্দ্র ছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন সিন্ধুদেশে পুরাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে মৌসুম বায়ু (Monsoon) প্রবাহিত হইয়া প্রচুর বারিপাতের সূচনা করিত। অধুনা ঐ বায়ুর গতি-পরিবর্ত্তন হেতু সিন্ধুদেশ বর্ষাঋতুর বহির্ভূত হইয়াছে এবং তজ্জন্য সেখানে রুক্ষ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। মুলতান প্রভৃতি স্থানে যে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইত, তাহার উল্লেখ মুসলমান ঐতিহাসিকদের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মনে হয় মোহেন্-জো-দড়োতে তাম্রপ্রস্তর যুগে (Chalcolithic Age) মৌসুম বায়ু প্রবাহিত হইয়া তত্রত্য বারিপাত নিয়ন্ত্রিত করিত, এই যুক্তি নিতান্ত অমূলক নহে।

মেসোপটেমিয়াতে মোহেন্-জো-দড়োর সমসাময়িক যুগে মানুষের বাসোপযোগী কাঁচা ইটের গৃহ তৈরী হইত। সেখানে তাম্রপ্রস্তর যুগের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়া ও বারি-

পাতের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঐ দেশে আবিষ্কৃত কাঁচা ইটের বহু গৃহ এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর বিষয়েও কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে একই আবহাওয়া সেখানেও চিরকালই চলিয়া আসিয়াছে। ব্যষ্টিগত প্রমাণের অবতারণা করিয়া এই যুক্তি হয়ত তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু সমষ্টিগত উপাদান গ্রহণ করিলে অতি পুরাকালে সিন্ধুতীরে যে অধিক মাত্রায় বারিপাত হইত সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বেলুচিস্থানের ভারত-সীমান্তবর্ত্তী জেলাগুলিতেও ঐ যুগ হইতে জলবায়ুর যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাও সিন্ধুপ্রদেশের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে। বেলুচিস্থানের জনহীন উষর ভূমির স্থানে স্থানে স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্ (Sir Aurel Stein) প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমৃদ্ধিশালী বসতির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। এ সব স্থানের কোথাও কোথাও সারা বৎসরের উপযোগী জল জমা রাখিবার জন্য বাঁধ (স্থানীয় ভাষায় ঐগুলিকে "গব্বর্ বাঁধ" বলে) দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বারিপাত হইত তাহা হইলে ঐ সব বাঁধের কোনই আবশ্যকতা থাকিত না। তৃতীয়তঃ বেলুচিস্থানের এই উষরভাব তাম্রপ্রস্তর যুগের পরে এবং খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর অর্থাৎ গ্রীকবীর আলেক্সান্দরের আক্রমণের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া থাকিবে; কারণ আলেক্সান্দরের ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে গেড্রোসিয়া (Gedrosia) বা বেলুচিস্থান তখন মরুভূমির মত এবং সৈন্যদের পক্ষে

অনতিক্রমণীয় ছিল। সে যাহা হউক বেলুচিস্থান সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে তাম্রপ্রস্তর যুগে (Chalcolithic age) বৎসরে ১৫-২০ ইঞ্চি বারিপাত হইত এবং সিন্ধুদেশের পক্ষেও এইরূপ বৃষ্টিপাত ধরিয়া লইলে মোহেন্-জো-দড়ো হইতে সংগৃহীত প্রমাণের সঙ্গে সুন্দররূপে খাপ খাইয়া যায়। কিন্তু এই উভয় স্থানে একই নৈসর্গিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল কি না এবং পরবর্ত্তী কালে উভয়ের এই শুষ্ক আবহাওয়া একই কারণজাত কি না, এই প্রশ্নের কোন সুসমাধান এখনও হয় নাই।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে এক সময়ে সাহারা ও মিসর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর বারিপাত হইত এবং আরবদেশ, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া ন্যূনাধিক বৃষ্টিপাত হইত; কিন্তু ঝড়বৃষ্টির গতি-পরিবর্ত্তন হওয়াতে এই সব দেশ এখন প্রায় মরুভূমির মত হইয়া পড়িয়াছে। এই মতটি যদিও চিত্তাকর্ষক, তথাপি সিন্ধুদেশের পক্ষে হয়ত এই যুক্তি ঠিক খাটিবে না, কারণ সিন্ধুদেশ এই বেষ্টনীর অন্তর্গত ছিল না বলিয়াও অনেকে মনে করেন।

মোহেন্-জো-দড়োর মাটী এত লোনা এবং জলবায়ু এত নীরস যে স্তূপগুলির ভিতরে ক্ষয় হইয়া বড় বড় গর্ত্ত দেখা দিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে খালের মত হইয়া সমগ্র স্থানটীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। একটী ঢালু জায়গা সরলভাবে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ঐ স্থানের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে রাশি রাশি ধ্বংসস্তূপ; ইহা প্রাচীনকালে সহর-বাসীর একটী সদর রাস্তা ছিল বলিয়া খননের পর আবিষ্কৃত

হইয়াছে। ঐ রাজপথকে ছেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে আর একটী বড় রাস্তা বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; ইহা এতদিন ধ্বংসস্তূপের অন্তরালেই ছিল। আর্কিওলজিকেল বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর-জেনারেল্ স্যর্ জন্ মার্শাল্ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের খননের ফলে এই রাস্তা বহুদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য বিপণি, পয়ঃপ্রণালী, জল-কূপ এবং আবর্জ্জনা-কূপ দেখা দিয়াছে। ছোট বড় আরও অনেক রাস্তা এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সকল রাস্তার প্রায় সবই পূর্ব্ব-পশ্চিমে কিংবা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এখানে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে রাজপথগুলি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ এবং সরু রাস্তা বা গলি হইতে অপেক্ষাকৃত নীচু; ইহার কারণ এই যে বন্যার জলে সমস্ত সহর প্লাবিত হইয়া গেলে পর পুনরায় গৃহ-নির্ম্মাণের সময় আবার যাহাতে বন্যায় ভাসাইয়া না লইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ঐ স্থানটা উঁচু করিয়া নির্ম্মাণ করা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে চলাচলের সুবিধার জন্য সম্মুখবর্ত্তী ছোট রাস্তাও উঁচু করিতে হইত; কিন্তু সদর রাস্তার প্রতি কেহই মনোযোগ দিত না, সেজন্য ইহার উচ্চতা আর বাড়ে নাই। ঐ ছোট গলি রাস্তাগুলির উপরে আবার ড্রেন তৈরী করা হইত এবং পুনঃপুনঃ বাস্তুভিটার উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎসংলগ্ন ড্রেনগুলিও উঁচু করিতে হইত; এবং ঐগুলিকে সদর রাস্তার প্রধান ড্রেনের সঙ্গে উপর দিক্ হইতে খাড়াভাবে অপর একটী ড্রেনের দ্বারা মিলাইয়া দিতে হইত।

প্রাচীন মোহেন্-জো-দড়ো নগর বর্ত্তমান স্তূপাচ্ছাদিত স্থান অপেক্ষা বহু বিস্তীর্ণ ছিল। স্তূপের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ

প্রাচীন সহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বন্যা ও কালের কঠোর প্রকোপে ইহার বাহিরের চিহ্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহুদূর (প্রায় অর্দ্ধমাইল) পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে শুধু মৃৎপাত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড দেখিয়া মনে হয়, পুরাতন সহর ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নগরের বহিঃস্থিত প্রাচীরও সময়ের আবর্ত্তনে খুব সম্ভব পড়িয়া গিয়া ধ্বংসস্তূপে মিশিয়া গিয়াছে। ইহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন আর নাই। ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন, এই নগরের চতুর্দ্দিকে কোন প্রাচীর ছিল না। কিন্তু স্যর্ জন্ মার্শাল্ এই অনুমানের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন এই নগরের সমৃদ্ধির সময়, আদি ও মধ্য যুগেই ছিল। সেই সময় যদি কোন দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া থাকে তবে হয়ত এখনও ইহা ভূগর্ভে ২৫।৩০ ফুট নীচে নিহিত থাকিতে পারে। কারণ উপরের অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালের তিন স্তরে প্রাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী ও ইমারত প্রভৃতিতে সিন্ধু সভ্যতার অতীব শোচনীয় চিত্র পাওয়া যায়। নিম্নস্তরে আদি ও মধ্য যুগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরাবস্তু (antiquities) ও গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে শুধু সেই প্রাচীন সভ্যতার রক্তমাংস বিবর্জ্জিত কঙ্কাল-মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই তৃতীয় যুগে গৃহ-প্রাচীর এবং আসবাবপত্র ক্রমশঃ অবনতির দিকে গিয়াছে। আদি যুগের ইমারতগুলি জলের বহু উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন জল ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০।৩৫ ফুটের মধ্যে চলিয়া আসায় ঐগুলি খনন করা কষ্টসাধ্য। সেইজন্য মাত্র সাতটী নগরের বিষয় আজ পর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। তৃতীয় যুগের তিনটী, দ্বিতীয় বা মধ্য যুগের তিনটী এবং আদি

যুগের একটী। প্রথম যুগের দুইটী নগর জলগর্ভে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রীষ্মকালে জল ভূপৃষ্ঠ হইতে ২৫।৩০ ফুটের মধ্যে থাকে, এবং বর্ষাকালে ১০।১৫ ফুটের মধ্যে আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে জল যে স্থানে ছিল এখন সে স্থান হইতে প্রায় ১০।১৫ ফুট উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের নাগরিকদের কারুকার্য্যের মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয় যে পুরাতন আসবাবপত্র, খেলনা, গহনা, মৃৎপাত্র, ইমারত ও মূর্ত্তি প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের অপেক্ষা অতিশয় মনোরম। কিন্তু মৃৎপাত্র-রঞ্জন বিষয়ে পরবর্ত্তী কালের লোকেরা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ বহু রঙ্‌বিশিষ্ট মৃৎপাত্র এই তৃতীয় যুগেই দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কার ও খনন

যে সব আবিষ্কার সৃষ্টির আদি হইতে মহামানবের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান ভাণ্ডারে এক একটি ধ্রুবতারার মত এক একটি দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, দেশ-কাল-পাত্রের কোন অপেক্ষা রাখে না; সর্ব্বদা স্বচ্ছ, অনাবিল ও নূতন; কালের কলুষ হস্ত যাহাতে কদাপি স্পর্শ করিয়া ওলট্-পালট্ করিয়া দিতে পারে না; যাহা যাদুকরের মায়াময়-যষ্টি-স্পর্শের মত বহু দিনের সুপ্ত মানবজাতিকে জাগ্রত করিয়া নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিতে এবং তাহাদের দৃষ্টির গণ্ডী প্রসারিত করিয়া দিতে পারে, সেই সব আবিষ্কার প্রতিদিন হয় না। শতাব্দীর মধ্যে দুই একটী হয় কি না সন্দেহ। এই জাতীয় চিরস্মরণীয় ঘটনা সহস্র সহস্র বৎসর পরেও মিসরের পিরামিডের মত মস্তক উন্নত করিয়া স্রষ্টার অজেয় অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করে। যিনি এরূপ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন তিনি দৈবপ্রেরিত, এবং নিজেও জানেন না কি করিতে তিনি আসিয়াছেন। জগতে যত স্মরণীয় আবিষ্কার হইয়াছে, ইহাদের শতকরা নিরানব্বইটাই ভারত-প্রত্যাশী কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মত দৈবাৎ সংঘটিত হইয়াছে।

আলেক্সান্দরের ইতিহাস লেখক কর্ত্তৃক বর্ণিত কাহিনী পড়িয়া পশ্চিম-ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের তদানীন্তন

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী আকাঙ্ক্ষা জাগে, শতদ্রু নদীর কোন্ স্থান হইতে সেই বিশ্ব-বিজয়ী গ্রীকবীর পাটলিপুত্রের অজেয় সেনাবাহিনীর শৌর্য্য-বীর্য্যের বার্ত্তা শুনিয়া সসৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নিজের বিজয়বার্ত্তা কোন্ কোন্ স্থানে গ্রীক ও ভারতীয় ভাষাযুক্ত দ্বাদশটি শিলামঞ্চ উত্তোলন দ্বারা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন। এই মঞ্চগুলি আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ১৯১৭-১৯১৮ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচটি শীতঋতুতে তিনি সিন্ধু ও শতদ্রুর শুষ্ক খাত্ স্থানে স্থানে পরীক্ষা-কল্পে দক্ষিণ-পাঞ্জাব, বিকানীর, বাহাওয়ালপুর, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করেন। তিনি অধুনালুপ্ত হাক্রো নদীর (Hakro river) শুষ্ক ধারার অনুসরণ করিয়া বাহাওয়ালপুর রাজ্য হইয়া সিন্ধুদেশের সাক্কর জেলায় সিন্ধুনদের কাছে উপস্থিত হন। সিন্ধুর শুষ্ক ধারার পাশে পাশে তিনি বহু প্রাচীন বসতির চিহ্ন দেখিতে পান। অবশেষে তিনি সেখান হইতে লারকানা জেলায় উপস্থিত হন এবং প্রাচীন স্তূপের সন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া মোহেন্-জো-দড়োর বৌদ্ধস্তূপযুক্ত স্থানটি খননকার্য্যের জন্য মনোনীত করেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে ১৯২৭ সালের শেষভাগে তিনি একদিন হরিণ-শিকারে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মোহেন্-জো-দড়োতে উপস্থিত হন; তখন সেখানে চকমকি পাথরের একটী ছুরিকা দেখিয়া স্থানটী অতি প্রাচীন বলিয়া তাঁহার মোটামুটি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

অতঃপর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোহেন্-জো-দড়ো নগরের খননকার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু জিনিষ

প্রাপ্ত হন। তাহার পূর্ব্বে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ইহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু উপরের বৌদ্ধস্তূপ এবং আধুনিক যুগের ইটের মত ইট দেখিয়া এই নগরের প্রাগৈতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান হন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল বৌদ্ধস্তূপ ও চৈত্যবিহার উদ্ধার করা। এখানে যে এত প্রাচীন-কালের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। খননের ফলে অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত কয়েকটী পাথরের শীলমোহর তাঁহার হস্তগত হয়। এইগুলি স্যর্ আলেকজেণ্ডার্ কানিংহাম্ কর্ত্তৃক বহু বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা নগরে প্রাপ্ত শীলমোহরের মত। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দেই রায়-বাহাদুর দয়ারাম স্বাহনী-ও হরপ্পায় খননকার্য্য আরম্ভ করিয়া আবার তাম্রপ্রস্তর যুগের শীলমোহর ও বহু পুরাতন জিনিষ-পত্র প্রাপ্ত হন। এইগুলি রাখালবাবু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত জিনিষের সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়। কাজেই মোহেন্-জো-দড়োর সঙ্গে হরপ্পার সভ্যতা বিষয়ে সামঞ্জস্য সহজেই প্রমাণিত হইয়া যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্তূপের নিকটে এবং দূরে তিন চারি স্থানে একটু গভীর দেশ পর্য্যন্ত খনন করেন। কিন্তু গ্রীষ্মঋতুর আগমনের ফলে কাজ অধিক দূর অগ্রসর না হইতেই তাঁহাকে বিরত হইতে হয়। তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির বলে ঠিক করেন যে যদিও বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারের ইট এবং নীচের প্রাসাদের ইট একই মাপের, এবং স্তূপ ও বিহার হইতে উক্ত প্রাসাদ মাত্র ১২ ফুট নীচে অবস্থিত তথাপি ইহা অন্ততঃ ২।৩ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হইবে। এরূপ অল্প প্রমাণের বলে এত বড় বিস্ময়কর কথা উচ্চারণ করা অসীম অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক।

পরবর্ত্তী কালের খননের এবং গবেষণার ফলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান স্থানে স্থানে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এম্. এস্. বৎস খননকার্য্য গ্রহণ করেন; এবং তিনিও তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু দ্রব্য এবং সুন্দর বড় বড় ইমারত আবিষ্কার করেন। ঐ সকল গৃহে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের বসতি ছিল বলিয়া মনে হয়।

১৯২৪-২৫ সালে মিঃ কে. এন্. দীক্ষিত অপেক্ষাকৃত অধিক টাকা লইয়া খননকার্য্য আরম্ভ করেন; এবং A. B. C. D. E. নামক স্তূপে খাত্ খনন করেন। তিনি বহু ইমারত আবিষ্কার করেন এবং ছোটখাটো অনেক সুন্দর জিনিষ প্রাপ্ত হন। এই বৎসর তিনি এক প্রস্ত (set) বহুমূল্য অলঙ্কারও (jewellery) প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ মূল্যবান্ জিনিষ আর এই নগরে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সব পরীক্ষামূলক খাত্‌-দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই মোহেন্-জো-দড়ো নগর বাস্তবিকই তাম্রপ্রস্তর যুগের কোন একটী সমৃদ্ধিশালী জাতির বাসস্থান ছিল। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক পণ্ডিতমণ্ডলী এবং ভারতীয় জনসাধারণ এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন যে বিভাগীয় ডিরেক্টার জেনারেল স্যর্ জন্ মার্শাল্ অল্প প্রয়াসেই ভারত গভর্নমেণ্টকে ইহা খননের সার্থকতা বুঝাইয়া প্রচুর অর্থ মঞ্জুরের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে ভারত সরকার ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহেন্-জো-দড়ো খননের জন্য তাঁহার হস্তে বহু অর্থ প্রদান করেন; এবং তিনি উত্তর- ও পশ্চিম-ভারতের আর্কিওলজিকেল্ বিভাগের সমস্ত কেন্দ্র হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট্ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান

করিয়া বিশেষ ভাবে খননের ব্যবস্থা করেন। নির্জ্জন অরণ্যে পরিষ্কার রাস্তা, তাঁবু, নলকূপের ব্যবস্থা হইল এবং ক্রমে আফিস ঘর, বাংলো, গুদাম, যাদুঘর (museum), কর্ম্মিনিবাস, বাগান প্রভৃতি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বসিয়া গেল। "প্রেত-পুরী" এখন শত শত কুলীদের দ্বারা সজীব ও মুখরিত হইয়া উঠিল। ডোক্‌রী ও লার্‌কানায় যাহাতে সহজে যাতায়াত করা যাইতে পারে তজ্জন্য রাস্তা নির্ম্মাণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করা হইল। এইবারের খনন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই পরম ভাগ্যবান্ এবং একটা অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া থাকিবেন। এই খননের ফলে বহু ঘরবাড়ী, ড্রেন, পায়খানা, স্নানাগার (bathroom) কূয়া, রাস্তা ও অসংখ্য পুরাদ্রব্য (antiquities) আবিষ্কৃত হয়। মোহেন্-জো-দড়োর খনন-ব্যাপার এত বৃহৎ ও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে যে ওয়েষ্টার্ণ্ সার্কেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দ্বারা তাঁহার অন্যান্য কর্ত্তব্যের উপর ইহার খননকার্য্য গুরুভারপূর্ণ হইয়া উঠে। সেজন্য মার্শাল্ সাহেবের চেষ্টায় ভারত গভর্নমেণ্ট শুধু ঐ খনন ব্যাপারের জন্যই একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন এবং প্রথমতঃ মিঃ (অধুনা ডাঃ) ই. ম্যাকে নামক বিশেষজ্ঞকে এসিষ্টাণ্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত করা হয়; পরে তাঁহাকে "স্পেসিয়াল অফিসার" বা বিশেষ কর্ম্মচারী আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহনীর অধীনে কাজ করিতে দেওয়া হয়। উক্ত রায়বাহাদুর, বিভাগীয় অন্যতম কর্ম্মচারী হার্‌গ্রিভস্ সাহেব পূর্ব্ববৎসরে যে ভূখণ্ডে খনন করিয়াছিলেন

তাহারই অসম্পূর্ণ কার্য্য আরম্ভ করেন; এবং ম্যাকে সাহেব স্তূপের নিকট 'L' নামক খণ্ডে খনন করেন। তাঁহারা উভয়েই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার অনেক মূল্যবান্ দ্রব্য আবিষ্কার করেন এবং মিঃ সাহনী বহুমূল্য গহনাপত্র উদ্ধার করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগর ও নাগরিক জীবন

তাম্রপ্রস্তর যুগের প্রত্যেক বিশিষ্ট সভ্যতাই কোন-না-কোন সুবৃহৎ নদীর তীরে জাত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। নীল নদের তীরে প্রাচীন মিসরের সভ্যতা, তাইগ্রীস্ (Tigris) ও ইউফ্রেটিস্ (Euphrates) তীরে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা এবং সিন্ধুতীরে মোহেন্-জো-দড়োর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই জন্য এই যুগের সভ্যতাকে আমরা নদীমাতৃক সভ্যতা বলিয়াও আখ্যা দিতে পারি।

এই নদীমাতৃক সভ্যতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রাচ্য সভ্যতার আদি জননী মোহেন্-জো-দড়ো নগরী সিন্ধুতীরে ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছিল। এই নগরের পরিকল্পনা ও পূর্ত্ত-রহস্য প্রভৃতি দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কোন সুদক্ষ শিল্পী নাগরিক স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই নগরের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সমস্ত নগরটী বড় বড় রাস্তা বা রাজপথ-দ্বারা বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত। পল্লীগুলি আবার সুবৃহৎ ইমারতে, এবং ইমারতগুলি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকিত। পল্লী ও ইমারতের পরিকল্পনা সুন্দর চক-মিলান ভাবে হইত। ইমারতের পার্শ্বদেশ দিয়া গলি-রাস্তা যাইত। এক গলি হইতে অন্য গলি বা রাজপথে যাতায়াত করা যাইত, কোন

কোন স্থানে কাণা গলিও ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজপথের উপরের ইমারতগুলির সম্মুখের নীচের তলায় দোকান থাকিত। বাড়ীর ভিতরের ঘরে গৃহস্থেরা বাস করিত। পার্শ্ববর্ত্তী গলি হইতে ঐ সকল ঘরে প্রবেশের পথ ছিল। কোন কোন ইমারতের সংলগ্ন প্রাঙ্গণও (quadrangle) দেখিতে পাওয়া যায়।

মোহেন্-জো-দড়োর ইমারতগুলিতে বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। ঐগুলির ধ্বংসস্তূপ দেখিলে আধুনিক একটা সহরের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। এখানে ব্যবহৃত ইটের মাপ অনেকাংশে বর্ত্তমান কালের ইটের মতই।[১] ইহা দেখিয়া এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সন্দেহ হওয়া খুব স্বাভাবিক। এইরূপ ইট ইতিহাসের যুগে ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রাসাদে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় নাই। ইট, পাথর ও কাঠের উপর কারুকার্য্যের জন্য প্রাচীন ভারত বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখানে ইটে বা পাথরেও কারুকার্য্যের সেরূপ কোন চিহ্ন নাই। কারুকার্য্যপূর্ণ কাঠ হয়ত ছিল, কিন্তু থাকিলেও সেগুলির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, হয়ত পচিয়া মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

[১] মোহেন্-জো-দড়োতে সাধারণতঃ ১০½′ বা ১১′ × ৫½′ × ২¾′ মাপের ইট দেখিতে পাওয়া যায়। মি° কে. এন্. দীক্ষিত কাশ্যপ-সংহিতায় (শিল্পে) ১০½ বা ১১ × ৫½ × ২¾ অঙ্গুলি মাপের ইটের উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ১৮।৭।১৯৩৫ ইং তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকার ৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখানে স্থান ও কার্য্যবিশেষে কখনো কখনো কাঁচা ও পোড়া ইটের মাপ ১০¼′ × ৫′ × ২¼′ হইতে ২০¾′ × ৮¼′ × ২¼′ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

১০½′ × ৫¼′ × ২½′ মাপের ইট মানসার-শিল্পশাস্ত্রেও আছে। ১২ অঃ, ১৮৯-১৯২ পঙ্ক্তি।

মিসর এবং মেসোপটেমিয়ার মত কাঁচা ইটের ব্যবহার এখানকার মিস্ত্রীরাও জানিত; কিন্তু এই ইট মোহেন্-জো-দড়োতে শুধু শূন্য-স্থান-পূরণ কিংবা ভিত্তি-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। ইহা কখনও বহির্দ্দেশে অর্থাৎ লোকের দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত স্থানে ব্যবহৃত হইত না। কর্দ্দম ও খড়িমাটী (gypsum) প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচীরে পোড়া ইটের গাঁথনি দেওয়া হইত। সময় সময় পয়ঃপ্রণালীর ভিতরের দিকেও চূণ এবং খড়িমাটী-বিশেষের একত্র সমাবেশে ইটের গাঁথনি হইত। ছোট ছোট ইটের বাড়ীর বাহিরের দেয়াল সোজাভাবে খাড়া থাকিত; কিন্তু বড়গুলির ভিতরের দিক্ সোজা এবং বাহিরের দিক্ একটু টের্‌চাভাবে তৈরী হইত। কোন কোন অট্টালিকা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় বিশাল। অনবরত বন্যার ভয়েই বোধ হয় ঐগুলি এরূপ সুবৃহৎ ও চিরস্থায়ী করা হইত।

ভিত্তি—

জলের স্তরের নীচে পড়িয়া যাওয়ায় আদি যুগের ভিত্তির সন্ধান লাভ করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

মধ্যযুগের (Intermediate period) প্রাসাদের ভিত্তি খুব সুন্দর। ইহা ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডের পরিবর্ত্তে পোড়া মাটীর গুটিকার (nodules) উপর নির্ম্মিত হইত। তৃতীয় যুগের প্রাসাদের ভিত্তি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ধ্বংসস্তূপের উপরেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য এইগুলি অতি সহজেই ধ্বসিয়া পড়িয়া যায়।

মেজে—

স্নানাগারের মেজে সাধারণতঃ ইট খাড়াভাবে দিয়া এবং অন্যান্য মেজে ইট চেপ্‌টাভাবে বিছাইয়া তৈরী করা

হইত। স্নানাগারের মেজেতে ইট করাত দিয়া কাটিয়া কিংবা ঘষিয়া মসৃণ করিয়া ব্যবহার করা হইত। সেজন্য স্নানাগারের মেজে দেখিতে খুব সুন্দর।

দরজা-জানালা—

গৃহগুলির এক তলাতে দরজা দিয়া আলো ও বাতাস যাইত। স্থানে স্থানে জানালারও অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

দরজা, জানালা ও চৌকাঠ কাঠের হইত। পাথরে কিংবা ইটে গর্ত্ত করিয়া দরজার নীচের পার্শ্ববর্ত্তী কোণা বসান হইত। এইরূপ গর্ত্তবিশিষ্ট পাথর ও ইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃত খিলান তখনও জানা ছিল না। তখনকার লোকেরা ইট উপর্য্যুপরি সাজাইয়া করগুাকার খিলান (corbelled arches) তৈরী করিত। কিন্তু সুমের দেশে ঐ সময়ে প্রকৃত খিলান জানা ছিল।

কোন কোন গৃহের প্রাচীরগাত্রে কুলুঙ্গী (niche) দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি প্রভৃতি স্থাপনের জন্য সম্ভবতঃ ইহা ব্যবহৃত হইত।

সিঁড়ি—

উপরের তলায় ও ছাদে যাতায়াতের সিঁড়ি থাকিত; কিন্তু স্থানে স্থানে ঐগুলি খুব সরু ও খাড়া হইত।

কূপ—

জলের জন্য কূপ খনন করা হইত। ঐগুলি গোল কিংবা ডিম্বাকার। প্রায় প্রতি গৃহেই পোড়া ইটের তৈরী কূপ ছিল।

সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য বড় রাস্তা হইতে অনতিদূরে দুই গৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কূপ থাকিত। এইরূপ কূপের উপরে জলটানার দড়ির চিহ্ন এবং অদূরে মেজেতে কলসী রাখার বহু গর্ত্ত এখনও বিদ্যমান আছে। অনেক পল্লীবধূ একসঙ্গে জল লইতে আসিত। পর্য্যায়ক্রমে এক এক জন করিয়া জল তুলিত। সেইজন্য সকলকেই বহু সময় অপেক্ষা করিতে হইত। দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া থাকা অসুবিধাজনক বলিয়া তাহাদের বসিবার জন্য কূপের অল্প দূরে দেয়ালের গায়ে ইটের রোয়াক বা বসিবার স্থান থাকিত। এরূপ রোয়াকও স্থানে স্থানে কূপের কাছে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কুম্ভকারের ভাঁটি (পোয়ান বা পোন)—

মৃৎপাত্র ও ইট পোড়াইবার জন্য স্থানে স্থানে কুম্ভকারের ভাঁটি ছিল। এই গুলির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালী—

স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণে মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীরা যে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

লম্বা নর্দামাগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত। কিন্তু খাড়া নর্দামাগুলি সাধারণতঃ পোড়া মাটীর বড় নল দিয়া তৈরী হইত।

পায়খানা—

মোহেন্-জো-দড়োর লোকেরা পাকা পায়খানার ব্যবহারও জানিত। সহরের এক স্থানে (H. R. Area) গৃহের প্রকোষ্ঠে ছোট ছোট দুইটী পাকা পায়খানা আবিষ্কৃত হইয়াছে

উভয়ের সাম্‌নে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান ছোট ছোট পাকা মেজে রহিয়াছে। ঐ পায়খানাগুলির নীচে পুরীষাধার থাকিত, এবং পশ্চাৎদিকের ছিদ্র-পথ দিয়া বাহির হইতে মেথর ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিত। এইরূপ 'খাটা পায়খানা' এখনও আমাদের দেশে বিদ্যমান আছে।

জলনিকাশ, জলনিকাশের নল ও ময়লা জলের কুণ্ড—

জল নিকাশের জন্য গৃহের ছাদ হইতে বড় নল এবং নীচে ময়লা জলের কুণ্ড থাকিত। সদর রাস্তা হইতে মেথরেরা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইত। এই ব্যক্তিগত বিধান ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের ব্যবহৃত ময়লা জল গলির নর্দামা হইতে সদর রাস্তার নর্দামা দিয়া বড় আবর্জ্জনা-কুণ্ডে পড়িত। ইহাও মেথরেরা পরিষ্কার করিত। সদর রাস্তার স্থানে স্থানে আবার গোলাকার বা চতুষ্কোণ কুণ্ড (soak pit) থাকিত। ঐগুলি হইতে জল শুকাইয়া গেলে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। পরবর্ত্তীকালে (খ্রীষ্টীয় ১ম ও ২য় শতকে) তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে যে আবর্জ্জনা-কুণ্ড নির্ম্মিত হইত তাহার জল সহজে শুকাইতে পারিত না; কাজেই কিছু-দিন পরে একটা কুণ্ড ভরিয়া গেলে ইহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাবে আর একটা নির্ম্মাণ করিতে হইত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োর কুণ্ডের একটা সুবিধা ছিল এই যে ইহাতে মেথরেরা অনায়াসে প্রবেশ করিয়া পরিষ্কার করিতে পারিত।

কাঠ, তক্তা ও মাটীর উপর ইট, চেটাই প্রভৃতি পাতিয়া ঘরের ছাদ দেওয়া হইত। টালি বা কোনও ধাতু ছাদের কার্য্যে ব্যবহার করা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কোন কোন প্রাসাদের অত্যন্ত পুরু দেয়াল দেখিয়া মনে হয় ঐগুলি খুব উঁচু ছিল। স্যর্ জন্ মার্শাল অনুমান করেন, মোহেন্-জো-দড়োর মিস্ত্রীরা দ্বিতল বা ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণেও সমর্থ ছিল।

আর্দ্রভাব দূর করার জন্য দেয়ালের গায়ে শিলাজতু ব্যবহৃত হইত। বৃহৎ স্নানাগারের চতুর্দ্দিকে দেয়ালের মধ্যে শিলাজতুর পুরু অস্তর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহ-বর্ণনা—

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রধানতঃ তিন প্রকার ইমারত দেখা যায়। (১) বাসগৃহ, (২) দেবালয় বা ভজনালয়, ও (৩) সাধারণের স্নানাগার। বাসগৃহের আকার-প্রকার গৃহস্বামীর সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করিত। এই সহরের দক্ষিণাংশে একস্থানে [১] গৃহগুলি আয়তনে খুব ছোট; এক একখানা গৃহে দুইটী মাত্র কক্ষ। সম্ভবতঃ ঐগুলি গরীব লোকদের বাসগৃহ ছিল। আবার কোন কোন স্থানে [২] গৃহগুলি সুবৃহৎ এবং প্রাসাদতুল্য। ঐসব ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আবাসভবন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কোন কোন গৃহ ৮৫ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং ৪।৫ ফুট পুরু দেয়াল-বিশিষ্ট ছিল। এই সকল সুবৃহৎ গৃহের সঙ্গে দারোয়ানের ঘর, স্নানাগার, কূপ, প্রাঙ্গণ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি থাকিত। ভৃত্য-নিবাস, অতিথিশালা এবং পাকশালাও বড়লোকের বাড়ীর নীচের তলায় থাকিত। তাঁহারা নিজেরা দোতলাতেই

১ M.I.C. HR. area, B. Block 5 Nos. XXXIII to XLVII.

২ M.I.C. HR. Block 2 XVIII এবং Block 4.

থাকিতেন বলিয়া মনে হয়। দোতলায় এরূপ নিরেট (solid) একখানা ঘর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নীচের দিকে একতলায় কোন ফাঁক নাই। বন্যার ভয়েই বোধ হয় নিরেট পাকা ভিত্তির উপর ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বিপদের সময় অন্ততঃ একখানা কুঠরীতে ধনজন লইয়া প্রাণরক্ষাই বোধ হয় এরূপ গৃহনির্ম্মাণের উদ্দেশ্য ছিল।

ঐসব ঘরে হিমালয়জাত দেবদারু এবং স্থানীয় 'সীসম্' বা শিশুকাঠের তক্তা ও বরগা প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত।[১] এই সহরের কেন্দ্র স্থানে (?)[২] একটী গৃহের নক্সা (plan) চমৎকার। ইহার নীচের তলায় চারিটী আঙ্গিনা, দশখানা ছোট ছোট কুঠরী, তিনটী সিঁড়ি ও একখানা দারোয়ানের ঘর। এই গৃহে প্রবেশের তিনটী রাস্তা, এবং মধ্যবর্ত্তীটী সদরদরজা। ইহার সম্মুখ ১ সংখ্যক রাজপথের দিকে। কূপ-গৃহের একখানা দরজা ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য গৃহসমূহের মধ্যে সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী গৃহ[৩] সুবৃহৎ। ইহা মধ্যযুগে (Intermediate period) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নগরের দক্ষিণাংশেও[৪] এরূপ বড় বড় গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব সুবৃহৎ গৃহ কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, এইগুলি দেবমন্দির ছিল। মেসোপটেমিয়াতে প্রাচীনকালে দেবালয়গুলি রাজপ্রাসাদের অনুকরণেই

১ একস্থানে মেঝেতে ঐসব কাঠের অঙ্গার পাওয়া গিয়াছে।

২ M.I.C. VS. area House XIII.

৩ M.I.C. VS. area Section A, No XXVII.

৪ M.I.C. HR. area.

নির্ম্মিত হইত। মোহেন্-জো-দড়োর এই বৃহৎ গৃহ-সমূহের আশেপাশে প্রস্তর-নির্ম্মিত বড় বড় বলয়াকার দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। অনেকের মতে এগুলি এই যুগের লিঙ্গমূর্ত্তির অধঃস্থ গৌরীপট্ট। তাহা হইলে গৃহগুলিকে দেবালয় বলিয়া অনুমান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা অপেক্ষা আরও ছোটোখাটো দেবমন্দির ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু দেবমূর্ত্তি কিংবা পূজোপকরণ আশানুরূপ পাওয়া না যাওয়ায়, এই ধারণা সত্য কি না বলা খুব কঠিন। এক স্থানে চারি সারিতে (৪×৫) ইটের[১] কুড়িটি থামওয়ালা মধ্যযুগের (Intermediate period) এক সুবৃহৎ ইমারত আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে দর্শক কিংবা শ্রোতাদের উপবেশনের নিমিত্ত এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

মোহেন্-জো-দড়োর অন্যতম আশ্চর্য্য জিনিস, একটী বৃহৎ স্নানাগার। স্নানাগারটা এত সুবৃহৎ ও সুগঠিত যে এই যুগের পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দ্দিকে ৭।৮ ফুট পুরু প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্নানাগারের মধ্যভাগে একটী প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট, এবং গভীরতায় ৮ ফুট, একটী সন্তরণবাপী আছে। ইহা জলক্রীড়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। যদিও ভারতবর্ষের বহু তীর্থক্ষেত্রে এখনও যাত্রীদের স্নানাদির জন্য দেবমন্দিরের সন্নিকটে স্নানবাপী দেখিতে পাওয়া যায়,

[১] M.I.C. L. area.

এবং মোহেন্-জো-দড়োর এই জলাশয়-সম্পর্কেও কেহ কেহ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নেরই অবতারণা করিতে পারেন, তথাপি আমাদের মনে হয় সিন্ধু-সভ্যতার অভিজাত সম্প্রদায়ের জলকেলির জন্যই ইহা ব্যবহৃত হইত। কারণ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার যে মোহেন্-জো-দড়োবাসীর নাগরিকজীবন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্জ্জীব প্রতিভূ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্ফীত নরনারীর মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে—সেই সুশিক্ষিত জাতি জলকেলির মত সাধারণ আমোদপ্রমোদের জন্য যে একটী জলাশয় রাখিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে জলকেলির জন্য অভিজাত সম্প্রদায়ের বাপী থাকিত বলিয়া সংস্কৃত কাব্যে যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুতীরে যে একটী উন্নত ও সৌখিন জাতির বাস ছিল, এই সব ছোটোখাটো বিষয় হইতেও খুব পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সন্তরণবাপীটীর নির্ম্মাণকৌশল খুব চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত্তবিশেষজ্ঞও ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্য অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্ত্তী কূপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটী জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জল-নিকাশের জন্য দক্ষিণপশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে ৩।৪ ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মসৃণ ইটের গাঁথনী দেওয়া হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গেই স্যাঁৎসেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর (bitumen) প্রলেপ দিয়া, যাহাতে ইহা গড়াইয়া না পড়িতে পারে তজ্জন্য এক সারি মসৃণ পাতলা ইট দিয়া

চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বাহিরে অল্প দূরে চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া আর একটী পাকা দেয়াল আছে। এই দেয়াল এবং শিলাজতুর পাতলা দেয়ালের মধ্যে খালি জায়গাটী কর্দ্দম দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল। এই মাটীর দেয়ালের মধ্যে জলাশয়ের চারি কোণে শিল্প বা ভাস্কর-কার্য্যের জন্য পোড়া ইটের চারিটী সমান আয়তনের চতুষ্কোণ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইগুলির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে। উল্লিখিত পাকা দেওয়ালের সমান্তরাল ভাবে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া বহু বাতায়ন-বিশিষ্ট একটী দেয়াল এবং তাহার বাহিরে বারান্দা এবং তৎপরে আর একটী সমান্তরাল ইষ্টক-প্রাচীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই সুগঠিত পূর্ত্তকর্ম্মটীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য বাতায়ন-বিশিষ্ট প্রাচীরের গায়ে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীর হইতে কয়েকটী ছোট ছোট দেয়াল আড়াআড়ি ভাবে আসিয়া মিলিয়াছে।

এই স্নানাগারে প্রবেশের জন্য বাহিরের প্রাচীরের উত্তর দিকে একটী, দক্ষিণ দিকে দুইটী ও পূর্ব্বে অন্ততঃ একটী দ্বার ছিল। পশ্চিম দিকেও হয়ত প্রবেশ-পথ ছিল, কিন্তু ঐ দিকের প্রাচীরের অস্তিত্ব লোপ হওয়ায় এবিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা কঠিন।

সিন্ধু-সভ্যতার তৃতীয় যুগে এই পল্লীতে নানারূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দেখা যায়। বন্যার ভয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া ভিত্তি শক্ত ও পাকা করা হয়। উত্তর দিকে এক বৃহৎ মোটা দেয়াল তোলা হয়, এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য সিঁড়ি তৈরী হয়। বন্যার প্রতিষেধক উপায়-স্বরূপ এই সব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এই স্নানাগারে অন্ততঃ একটা উপরতলা ছিল, কারণ উপর হইতে একটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে সিঁড়ি এবং এক প্রান্তে নর্দামা নামিয়া আসিয়াছে। উপরে ঘর না থাকিলে ঐগুলির কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এই চত্বরের বাহিরের দেয়াল-গুলি উপরতলা পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং উপরেও নীচের ঘর-গুলির অনুকরণে ঘর তৈরী করা হইয়াছিল বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন। খননের সময় কাঠকয়লা ও ভস্ম পাওয়াতে তিনি মনে করেন যে উপরতলায় কাঠের আসবাব-পত্র প্রচুর পরিমাণে ছিল।

এই জলাশয়ের উত্তর দিকে একটী গলির উভয় পার্শ্বে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই সারি স্নানাগার রহিয়াছে, ঐ ঘরগুলির প্রত্যেকটীতে একটী করিয়া দ্বার এবং পয়ঃপ্রণালী আছে, প্রতি ঘরে উপরে যাওয়ার সিঁড়িও রহিয়াছে। ইহা হইতে ডাক্তার ম্যাকে অনুমান করেন যে এই সকল স্নানগৃহ এঁখানকার পুরোহিতদের জন্য ছিল। তাঁহারা উপর তলার প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন এবং সেখান হইতে স্নানাগারে আসার জন্য সিঁড়ি তৈরী করা হইয়াছিল।[১]

এই শ্রেণীবদ্ধ স্নানাগারগুলি রাস্তার উভয় দিকে এরূপ-ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে একটী স্নানগৃহের দরজা অন্য স্নান-গৃহের দরজার ঠিক সাম্না-সাম্নি নয়। কাজেই এইগুলিতে স্নানার্থীদের প্রত্যেকেরই একান্ত-ভাব রক্ষা পাইত। বৃহৎ স্নানাগারের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটী গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে ৫ ফুট উচ্চ কয়েকটী চতুষ্কোণ ইষ্টকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐগুলিতে চুল্লী

[১] Arch. Sur. Rep. 1927-28, p. 70.

বসানোর জন্য খাঁজ কাটা রহিয়াছে। মঞ্চদ্বয়ের মধ্যে আড়া-আড়ি-ভাবে ছোট রাস্তা আছে এবং ঐ ঘরের মেজের মধ্যে ধাতুমল, কাঠ-কয়লা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন যে এই গৃহে চুল্লীর সাহায্যে স্নানাদির জন্য উত্তাপ-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুরাবস্তু (ANTIQUITIES)

খাদ্য—

মোহেন্-জো-দড়োর পুরাদ্রব্যের মধ্যে ভূগর্ভে নিহিত পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন খাদ্য—যব ও গম—বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যব পুরাতন মিসরের কবরে পাওয়া গিয়াছে। যব ও গম ছাড়া খেজুরের বীচিও অতি প্রাচীন কালের দ্রব্যের সঙ্গে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, আমিষখাদ্যের মধ্যে মেষ, শূকর ও কুক্কুট প্রভৃতির মাংস সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্য ছিল বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন। ঘড়িয়াল কুমীর, কচ্ছপ, টাট্‌কা ও শুঁট্‌কী মাছ, সমুদ্রের শামুক প্রভৃতিও খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এই সকলের হাড় ও খোলা প্রভৃতি অর্দ্ধ-দগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দুগ্ধও সেকালের জনসাধারণের ব্যবহার্য্য ছিল বলিয়া নিঃসন্দেহ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খেজুর এবং অন্যান্য ফল-মূলও তৎকালের লোকদের খাদ্য ছিল।

গৃহপালিত জীবজন্তু—

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ভারতীয় বিশাল ককুদ্মান্ (humped bull), গরু, মহিষ, মেষ, হস্তী, উষ্ট্র, শূকর, ছাগল,

কুক্কুট [১] প্রভৃতি প্রাচীন মোহেন্-জো-দড়োতে ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। কুকুর এবং অশ্বের কঙ্কালও এখানে রহিয়াছে, কিন্তু উপরের স্তরে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সুপ্রাচীনকালে ইহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কুকুরের প্রাচীনত্বের বিষয়, কঙ্কাল ছাড়া, পোড়া মাটীর এবং পাথরের কুকুরমূর্ত্তি-দ্বারা প্রমাণ করার সুযোগ মোহেন্-জো-দড়োতেই আছে। অশ্ব সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

বন্য জন্তু—

হরিণ, বন্য গরু, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বানর, ভল্লুক, নকুল, ছুঁচা, ইঁদুর, কাঠবিড়াল ও খরগোস প্রভৃতির আকৃতি পোড়া মাটী, ফায়েন্স (faience), ব্রোঞ্জ্ এবং নরম পাথরের শীলমোহর প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। চারি প্রকারের হরিণের (১। কাশ্মিরী হরিণ, ২। শম্বর, ৩। চিত্রিত হরিণ, ও ৪। সাধারণ হরিণ) শিং উদ্ধার করা হইয়াছে; ঐগুলি হয়ত

[১] গৃহপালিত কুক্কুটের ব্যবহার সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ বা চট্টগ্রাম হইতে সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাই ডারউইনের অভিমত এবং সর্ব্ববাদিসম্মত। যাবতীয় গৃহপালিত কুক্কুটই শিখাবিশিষ্ট কুক্কুটের বংশধর। গৃহপালিত শূকর নবপ্রস্তর যুগে (Neolithic age) সুইজারল্যাণ্ডে হ্রদবাসীদের (Lake dweller) গৃহে বিদ্যমান ছিল। পরবর্ত্তীকালে তাম্রপ্রস্তর যুগে এশিয়ার মোহেন্-জো-দড়োর সমসাময়িক সুসা, এনাও প্রভৃতি স্থানেও ইহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নবপ্রস্তর অস্ত্র-ব্যবহারী পলিনেসিয়ার (Polynesia) অধিবাসীদের শূকর ও কুক্কুট, এই দুইটী মাত্র গৃহপালিত প্রাণী ছিল। সুতরাং মনে হয় এশিয়াতে গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কুকুরের পরেই শূকর ও কুক্কুটই প্রাচীনতম।—Reference from Dr. P. Mitra.

কোন ঔষধে ব্যবহারের জন্য দূর স্থান হইতে আমদানী করা হইয়াছিল বলিয়া কর্নেল স্যুয়েল অনুমান করেন।

শিলাজতু—

ঔষধে ব্যবহারোপযোগী শিলাজতুও এখানে পাওয়া গিয়াছে; ইহা সচরাচর হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়। ঐ সময়ে আর্দ্রতা দূরীকরণের জন্যও ইহার ব্যবহার হইত। জলের আর্দ্রতা যাহাতে দূরে প্রসারলাভ করিতে না পারে তজ্জন্য সন্তরণবাপীর দেয়ালের গায়ে শিলাজতুর এক ইঞ্চি পুরু প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা এখনও বিদ্যমান আছে।

ধাতু—

ধাতুদ্রব্যের মধ্যে মোহেন্-জো-দড়োতে সোনা, রূপা, তামা, টিন, সীসা ও ব্রোঞ্জ দেখা যায়। ঐগুলি ভারতীয়, কিংবা পারস্য, আফগানিস্থান, আরব অথবা তিব্বত দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। স্যর এড্উইন্ পাস্কো অনুমান করেন যে সোনা দক্ষিণ-ভারত (হায়দ্রাবাদ, মহীশূর অথবা মাদ্রাজ প্রদেশ) হইতে আনা হইয়াছিল। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার-খনির ও মাদ্রাজের অন্তর্গত অনন্তপুরের সোনার সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর সোনার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়; কারণ নীলগিরির সবুজ 'আমাজন' নামক পাথরও এখানে দেখা যায়; কাজেই দক্ষিণের সঙ্গে সিন্ধুতীরবাসীদের একটা আদান-প্রদানের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে করা খুবই স্বাভাবিক। সোনা দিয়া মালা, টোপ (boss) ইত্যাদি তৈরী হইত। মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত সোনার পরিমাণ খুবই কম।

রূপা—

রূপা সোনার চেয়ে অপেক্ষাকৃত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। গহনা-পত্র রাখার জন্য রূপার পাত্র ব্যবহৃত হইত। বড়লোকদের গহনার জন্যও রূপার চল ছিল।

সীসা—

ইহা এখানে তেমন প্রচুর মাত্রায় দেখা যায় না। সময় সময় সীসার টুকরা পাওয়া যায়, ঐগুলি হয়ত জাল ডুবাইবার জন্য খণ্ড খণ্ড ভাবে ব্যবহৃত' হইত। আজমীর, আফগানিস্থান অথবা পারস্য দেশ হইতে সীসা আমদানী করা হইত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

তামা—

তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্য এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। রাজপুতানা, বেলুচিস্থান, কাশ্মীর, আফগানিস্থান, পারস্য অথবা মাদ্রাজ হইতে বোধ হয় তামা আমদানী করা হইয়াছিল, প্রত্ন-বিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক মহাশয় অনুমান করেন, ইহা হয়ত রাজপুতানা, বেলুচিস্থান অথবা পারস্য দেশ হইতে আনীত হইয়া ছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত তামার গুণ বিশিষ্ট তামা আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, রাজপুতানা এবং হাজারিবাগেও দেখিতে পাওয়া যায়। তামা দিয়া যুদ্ধপ্রহরণ, যথা বর্শা, ছুরি, খড়্গ, কুঠার এবং নানা প্রকারের গৃহস্থালীর দ্রব্য 'ও অলঙ্কার, যথা বাসন-কোসন, বাটালি, পাত্র, বলয়, কানবালা, আংটী, মেখলা প্রভৃতি তৈরী হইত।

টিন—

পৃথক্ ভাবে টিন মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া যায় নাই। তামার সঙ্গে মিশ্রিতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রোঞ্জ—

তামা ও টিনের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ্ নামক নূতন ধাতুর সৃষ্টি হয়। ইহা তামার চেয়ে বেশী শক্ত। মোহেন্-জো-দড়োর ব্রোঞ্জে টিনের পরিমাণ শতকরা ৬-১৩ ভাগ। তামা দিয়া পূর্ব্বে যে সব জিনিস প্রস্তুত হইত সেই সব—এমন কি ধারাল অস্ত্রশস্ত্রও—ব্রোঞ্জ্ দিয়া নির্ম্মিত হইত।

কিন্তু টিন সহজলভ্য নয় বলিয়া ব্রোঞ্জ্ মোহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পাতে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। খাঁটী তামার দ্রব্যাদিই পরবর্ত্তী কালেও বহুল পরিমাণে চলিয়া ছিল। ব্রোঞ্জ্ ছাড়া তামা ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ্ অপেক্ষা একটু নরম অন্যতম মিশ্রিত ধাতুর ব্যবহারও মোহন্-জো-দড়োতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিশ্রধাতুতে আর্সেনিকের পরিমাণ শতকরা ৩ হইতে ৪½ ভাগ।

মোহেন-জো-দড়োতে প্রস্তর অত্যন্ত বিরল। এ স্থানের সন্নিকটে কোথাও প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহাদি-নির্ম্মাণ এবং আসবাবপত্রের জন্য পাথর অন্য স্থান হইতে আমদানী করা হইত। সিন্ধুতীরবর্ত্তী সাক্কর (Sukkur), কির্থার-পর্ব্বতমালা, কাঠিয়াওয়াড় ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থান হইতে সময়ে সময়ে নানা প্রকার পাথর সংগৃহীত হইত। পাথর যে দুষ্প্রাপ্য ছিল ইহা প্রাচীন কালের একটী যোড়া-দেওয়া পাত্র হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। পাথর দিয়া

শিল-নোড়া, পাশা, ওজন, দ্বার-কোঠর (door-socket) ; চকমকি পাথর (chert) দিয়া ওজন, পালিশের যন্ত্র, ছুরি ; সোপস্টোন (soap-stone) বা নরম পাথর দিয়া মূর্ত্তি ও শীলমোহর ইত্যাদি ; পীতবর্ণ জৈসলমীর পাথর দিয়া মূর্ত্তি, পূজার লিঙ্গ ও পট্ট প্রস্তুত হইত। চূণা পাথর ও স্লেট পাথর, নানারূপ পাত্র, মুষল, ও লম্বা ওজনের (cylindrical weight) জন্য ব্যবহৃত হইত। নরম শ্বেত পাথর (alabaster) দিয়া জাফরির কাজ, নানারূপ পাত্র ও ছোটখাটো মূর্ত্তি প্রভৃতি তৈরী হইত। অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ পাথর যেমন স্ফটিক, আকীক (agate), ক্যাল্‌সিডনি (chalcedony), লাল আকীক (carnelian), জ্যাস্‌পার (jasper) ইত্যাদি দিয়া মালার দানা ও অন্যান্য অলঙ্কার-পত্র প্রস্তুত হইত। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে গেরিমাটী, সবুজমাটী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য জিনিসের মধ্যে অস্থি, হস্তিদন্ত, ঝিনুক, ফায়েন্স (faience) বা চীনামাটীর অনুরূপ পোড়ামাটী, এবং কাচজাতীয় বস্তু (vitrified paste) প্রচলিত ছিল।

মোহেন-জো-দড়োতে সূতাকাটার যে বিশেষ প্রচলন ছিল, তাহা মাটী, শঙ্খ কিংবা ফায়েন্স-নির্ম্মিত নানা প্রকারের অসংখ্য টেকো এবং ভূগর্ভ হইতে লব্ধ পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন কার্পাস-সূতা হইতে সহজেই অনুমিত হয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা—

এখানে নানাজাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের অস্থিকঙ্কাল প্রভৃতির দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদও যে বিভিন্ন ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ নাই। ইহা প্রমাণ করার পক্ষে বর্ত্তমানে আমাদের হাতে যথেষ্ট উপাদান নাই; তবে দুইটী প্রাপ্ত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই পুরুষেরা বামস্কন্ধের উপর বেষ্টন করিয়া ডান হাতের নীচে দিয়া উত্তরীয় বা শাল ব্যবহার করিত। পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তিতে এই প্রণালীতে উত্তরীয় পরিধানের প্রথা দেখা যায়। মোহেন্-জো-দড়োতে কাপড় পরার নমুনা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। পোড়া মাটীর পুরুষ মূর্ত্তিগুলিকে মস্তকাভরণ ও অন্য সামান্য অলঙ্কার ছাড়া প্রায় নগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। তবে এইগুলি দেখিয়া মোহেন-জো-দড়োর জনসাধারণও নগ্ন অবস্থায় থাকিত বলিয়া ধারণা করা ভ্রান্তিপূর্ণ হইবে। যে জাতি সভ্যতার এত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিল এবং সূতা-কাটা ও কাপড়-বোনা জানিত তাহাদের খেলার পুতুল বা পূজার দেবদেবীর সাজসজ্জা দেখিয়া তাহাদের নিজেদের বিষয়ে এরূপ ধারণা করা ভ্রমাত্মক হইবে। পোড়া মাটীর স্ত্রীমূর্ত্তি, মাতৃকামূর্ত্তি কিংবা শক্তিময়ী মাতৃদেবীর (Mother Goddess) প্রতীক বলিয়া মনে হয়। ইহাদের কটিবন্ধে এক টুকরা বস্ত্র প্রদর্শিত রহিয়াছে। ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত নানা আভরণ-সজ্জিত নর্ত্তকীমূর্ত্তিটী নগ্ন অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, নর্ত্তকীরা নাচের সময়ে গহনাপত্র ছাড়া অন্য কোন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত না। তবে বাহিরে যাওয়ার সময়ে হয়ত তাহারা নগ্ন অবস্থায় বাহির হইত না; এই অনুমানের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এই ব্রোঞ্জ্ নর্ত্তকী যদিও আমরা নগ্ন অবস্থায় দেখি, তথাপি ইহা যে তখনকার দিনের নর্ত্তকীদের অবিকল

প্রতীক সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নগ্ন মূর্ত্তি ও চিত্র সভ্যজগতের বহু স্থানে পুরাতনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত শিল্পীর হাত দিয়া রূপ পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ও বর্ত্তমান কালে ইউরোপেও ভাস্কর ও চিত্রকলায় বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তৈরী অনেক নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব দেখিয়াই সামাজিক বস্ত্র-ব্যবহারের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই সম্পর্কে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে অধুনা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সব দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি কিংবা অন্য মূর্ত্তি পূজা বা অলঙ্করণের জন্য প্রস্তুত হয় সেগুলিতে শিল্পীরা বস্ত্রপরিহিত অবস্থা প্রদর্শন করেন না। তারপর গৃহস্বামীরা ঐসব মূর্ত্তিতে কাপড়চোপড় গহনাপত্র পরাইয়া সাজাইয়া রাখেন। ঐ মূর্ত্তিগুলি যদি মাটীর নীচে হইতে পাঁচ শত বৎসর পরে উঠাইয়া নগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে বর্ত্তমান যুগের জনসাধারণ কিংবা ইহার এক শ্রেণীর উপর নগ্নতার অপবাদ দেওয়া সমীচীন হইবে না।

পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ দাড়ি-গোঁফ রাখিত, আবার কেহ কেহ প্রাচীন আক্কাদ-(মেসোপটেমিয়া) বাসী শেমীয়-জাতির মত উপরের ওষ্ঠ কামাইয়া ফেলিত। মাথার চুল লম্বা করার নিয়ম ছিল। ঐগুলি পশ্চাদ্দিকে সুন্দর খোঁপায় বিন্যস্ত করা হইত।[১]

মস্তকের সম্মুখদিকে চুলের উপর সোনার কিংবা সুতার ফিতা বা বেষ্টনী থাকিত। এইরূপ স্বর্ণ-বেষ্টনী মোহেন্-

১ মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীদের ন্যায় লম্বা চুল রাখার প্রথা এখনও সিন্ধুপ্রদেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদের অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

জো-দড়োতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। চুলগুলিকে টুপীর ম সাজাইয়া পশ্চাদ্দিকে খোঁপায় বিন্যস্ত করার নিয়মং পোড়ামাটীর পুতুলে দেখিতে পাওয়া যায়।

চুলের বেণী বাঁধিয়া শিথিল ভাবে কবরী-বিন্যাসের প্রমাণও নর্ত্তকী-মূর্ত্তি হইতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কিংবা উষ্ণীষতুল্য বা বাটীর মত খোঁপাও সিন্ধুতীরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মুক্তকেশে কিংবা বেণীবিন্যাস করিয়া থাকার রীতিও নারীজাতীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

গহনাপত্র—

কালানুযায়ী মূল্যবান্ গহনাপত্র সকলেরই আদরের সামগ্রী, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির।

মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের নিকট গহনাপত্র বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল। হার, চুলের ফিতা, বলয় ও আংটী স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই ব্যবহার করিত। মেখলা, কাণের দুল বা কাণবালা, পায়ের মল ইত্যাদি স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য্য ছিল। ধনী লোকদের গহনা সাধারণতঃ সোনা, রূপা, ফায়েন্স, গজদন্ত ও মূল্যবান্ পাথর দিয়া তৈরী হইত। দরিদ্রের গহনাপত্র শাঁখা, হাড়, তামা, ব্রোঞ্জ্ এবং পোড়ামাটী দিয়া প্রস্তুত হইত। মেখলাগুলিতে লম্বা নলের মত মালার লহর থাকিত। ঐ লহরগুলি তামা কিংবা ব্রোঞ্জের কাঁড়ির (spacer) ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইতে হইত; এবং উভয় সীমান্তে দুইটী মুখসাজ (terminal) থাকিত।

কণ্ঠহারেরও অসংখ্য ছিন্ন মালা পাওয়া গিয়াছে। এই-গুলির মধ্যে নানাপ্রকারের লম্বা মালা দেখিতে পাওয়া

যায়। এইখানে সচরাচর যে সব মালা দেখিতে পাই তাহাতে লম্বা নলাকৃতি (barrel-shaped), গোলাকার, দন্তুরচক্র (cog-wheel) ইত্যাদি নমুনাই প্রধান ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ্, শাঁখা, হাড়, পালিস পাথর, কাচজাতীয় মণ্ড (paste) এবং পোড়ামাটী প্রভৃতি দ্বারা তৈরী হইত। উজ্জ্বল মূল্যবান্ পাথর দিয়া সময় সময় যে মালা প্রস্তুত হইত তাহার দৃষ্টান্তও ভূরি ভূরি আছে।

বলয় সাধারণতঃ তামা, ব্রোঞ্জ্, শাঁখা, ফায়েন্স ও পোড়ামাটী দিয়া তৈরী হইত। বলয় বোধ হয় একহাতে (বামহাতে) বাহু হইতে কব্জী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। এখানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত নর্ত্তকীমূর্ত্তি হইতেই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও ভারতবর্ষে গুজরাট ও রাজপুতানার কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকদিগকে এরূপ ভাবে বলয় কিংবা চুড়ি পরিতে দেখা যায়।

শৈশবে কোন কোন পল্লীগ্রামে চামার জাতীয় স্ত্রীলোকদের হাতে বহুসংখ্যক চুড়ি দেখিতাম। ইহারা বিহার কিংবা সংযুক্ত-প্রদেশ হইতে আগত। ইহারা হাতের কব্জী হইতে কনুই পর্য্যন্ত চুড়ি পরে, বগল পর্য্যন্ত নয়।

আংটীগুলি খুব সাধারণ রকমের ছিল, তামা, রূপা প্রভৃতি আংটী তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হইত।

অস্ত্রশস্ত্র—

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কুঠার, বর্শা, খড়্গ, তীর, ধনুক, মুষল ও বাঁটুল (sling) দেখিতে পাওয়া যায়। তরবারি তখন এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়

নাই। আত্মরক্ষার জন্য কবচ, শিরস্ত্রাণ ও জঙ্ঘাত্রাণ কিংবা অন্য কিছুর চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। দস্তুর বর্শা (টেটা), লম্বা কুঠার ও তরবারি গঙ্গাযমুনা-উপত্যকায় ও মধ্যপ্রদেশের গাঙ্গেরিয়া প্রভৃতি স্থানে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার যুগে এইগুলির কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। সিন্ধূপত্যকায় সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কুঠার দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার দেখিতে খর্ব্বাকৃতি কিন্তু খুব পুরু ও চওড়া। দ্বিতীয় প্রকার কুঠার দেখিতে লম্বা ও অপেক্ষাকৃত সরু।

বর্শাগুলি আদিম যুগের মত পাতলা এবং চওড়া। এই-গুলির মধ্যভাগে কোনও শিরা (midrib) নাই। গর্ত্তের পরিবর্ত্তে ইহাতে হাতল লাগাইবার লম্বা লেজ ছিল। ডাঃ ম্যাকে দেখাইয়াছেন ইজিপ্ট ও সুমেরে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের পূর্ব্বেই বল্লমে মধ্য-শিরা ও গর্ত্তের উদ্ভাবন হইয়াছিল।

তামা কিংবা ব্রোঞ্জ্ দিয়া সূক্ষ্ম তীরের ফলা প্রস্তুত করা হইত।

এখানে তিন প্রকারের মুষল দেখিতে পাওয়া যায়। পাথর কিংবা তামা দিয়া ঐগুলি নির্ম্মিত হইত। এই তিন প্রকারের মধ্যে নাসপাতির আকৃতি-বিশিষ্ট মুষলই বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

বাঁটুল বা ফিঙ্গার গুলি বা গুটিকা গোল কিংবা ডিম্বাকার হইত।

গৃহের দ্রব্য-সম্ভার ও তৈজসপত্র—

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে পাথর, ধাতু ও মাটীর জিনিসই প্রধান। চক্‌মকি পাথরের ছুরি, পাথরের কুঠার ও

পাথরের হলমুখ (plough share) দেখা যায়। থালা, বাটী, পাত্র, প্রসাধন-পেটিকা, পালিস যন্ত্র, রংদানি (palette) এবং ওজন প্রভৃতি পাথর দিয়া তৈরী হইত। এইসব সাধারণতঃ নরম মর্ম্মর (alabaster), চূণা পাথর কিংবা শ্লেট পাথর দিয়া প্রস্তুত হইত।

ওজন—

এখানকার ওজন সাধারণতঃ চক্‌মকি পাথরের। এইগুলি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় প্রায় সমান। চক্‌মকি পাথর খুব শক্ত ও সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বলিয়া ওজন প্রস্তুত করার পক্ষে উপযুক্ত। কাল ধূসর শ্লেট পাথরের লম্বা (barrel-shaped) ওজন, এলাম-দেশের (Elam) ও মেসোপটেমিয়ার (Mesopotamia) মত এখানেও পাওয়া যায়। বড় বড় ওজন-গুলি মন্দিরাকৃতি এবং এইগুলির নেমীতে রজ্জু দিয়া ঝুলাইবার জন্য ছিদ্র থাকিত। মিঃ হেমি-র (Mr. Hemmy) মতে এই ওজনগুলি এলাম ও মেসোপটেমিয়ার ওজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল। এইগুলির পরিমাণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় সুসার (Susa) ওজনের মত প্রথমতঃ দ্বিগুণিত—যথা ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, কিন্তু তৎপরে দশগুণোত্তর—যথা ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০ ইত্যাদি। সর্ব্বসাধারণ পরিমাণ ১৬= ১৩.৭১ গ্রাম, কিংবা ২১১.৫ গ্রেনের সমান।

ধাতু-, ফায়েন্স-, ও মৃৎ-পাত্র—

ধাতুপাত্র মোহেন্-জো-দড়োতে সংখ্যায় খুব কম। অঙ্গরাগ-দ্রব্য রাখার জন্য ছোটখাটো পাত্র তৈরী করিতে ফায়েন্স ব্যবহার করা হইত। অবশিষ্ট দ্রব্যের শতকরা

নিরানব্বইটী মৃন্ময়। মৃন্ময় পাত্রের মধ্যে নৈবেদ্য-পাত্র, (offering stand) গেলাস, মাল্‌সা, ডাবর, পেয়ালা, বাটী, থালা, গামলা, কড়া, রেকাবি, শরা, ছোট ভাড়, হাতা, পাত্রাধার, উত্তাপক যন্ত্র (চুল্লী) (heater), মট্‌কী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উৎসর্গ-পাত্র বা নৈবেদ্য-পাত্র হয়ত দেবতার কিংবা মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলি বা উপহারের জন্য ব্যবহৃত হইত। মেসোপটেমিয়াতেও এই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যবহৃত হইত। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে বড় পেয়ালাগুলির সংখ্যা হাজার হাজার; কূপ কিংবা ঢাকানর্দামা অথবা রাস্তার পাশে এইগুলি স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। ইহাতে মনে হয় এইগুলি পানপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইত, এবং আজকালও যেমন মাটীর পাত্র হিন্দুরা একবারের বেশী পানাহারের জন্য ব্যবহার করেন না, তৎকালেও বোধ হয় এই প্রথাই ছিল। সম্ভবতঃ উৎসবাদি-উপলক্ষে আমন্ত্রিতদের প্রত্যেককে একটি করিয়া পানপাত্র দেওয়া হইত। সেই জন্যই এইগুলি এত অধিক সংখ্যায় স্থানে স্থানে দেখা যায়।

উত্তাপক বা চুল্লীতে অসংখ্য ছিদ্র রহিয়াছে। স্যর অরেল্ স্টাইন বেলুচিস্থানে এরূপ কয়েকটী নমুনা পাইয়াছেন। সেগুলির ভিতরে ছাই লাগিয়া আছে। ইহাতে প্রমাণ হয় ঐগুলি চুল্লী ছিল। কিন্তু ঐগুলি ছাঁক্‌নি বা ঝাঁজর ছিল বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন।

বড় বড় মৃদ্‌ভাণ্ডগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী তৈল, জল ও শস্যাদির ভাঁড়ার বা আধার হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং অন্যশ্রেণী মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রেত-বলির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইত।

চিত্রকলা—

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার মৃৎপাত্র চক্রনির্ম্মিত এবং খুব মসৃণ। কোন কোন পাত্রের গায়ে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। পোড়া পাত্রের গায়ে গাঢ় লালের উপর কাল রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র, যথা—অন্যোন্যচ্ছেদক বৃত্ত (intersecting circles), ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পাত্র, বলয়, চিরুনি, মৎস্য-শল্ক, বৃক্ষ, লতা, পাতা ইত্যাদি আঁকা আছে। বন্যছাগ ব্যতীত জীবজন্তুর ছবি খুব কম ; যাহা আছে, তাহা বেলুচিস্থান হইতে আমদানী হইয়াছে বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন। লালের উপর কাল চিত্র পূর্ব্ব-বেলুচিস্থান ও সিন্ধু-উপত্যকা এই উভয় স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োর চিত্র স্থূল এবং অপরিপক্ক। পক্ষান্তরে বেলুচিস্থানের চিত্র সূক্ষ্ম ও সুন্দর। মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎশিল্প তেমন উন্নত প্রণালীর নয়। এই অপরিপক্ক শিল্প দেখিয়া যদি কেহ ইহা খুব আদিম সভ্যতার সূচক বলিয়া মনে করেন তবে ভুল হইবে। ইহা শিল্পী-বিশেষের অ-পারদর্শিতা বলিয়াও মনে করা যায় না। কারণ মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎপাত্র সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্ব-নিম্ন স্তরে অবিকল এক রকম। ইহাতে বুঝা যায় এখানকার মৃৎশিল্প শত শত বৎসর যাবৎ সমানভাবে চলিতেছিল এবং সেইজন্যই নমুনার কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি সাধিত হয় নাই। লালের উপর কাল চিত্র ছাড়া (১) কাচের মত উজ্জ্বল, (২) ক্ষোদিত এবং (৩) বহু বর্ণবিশিষ্ট মৃৎপাত্রও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রে বহু বর্ণের সমাবেশ-প্রণালী এখানে বড়ই চমৎকার। পীতাভ রংয়ের উপর কাল এবং লাল রং করা হইত।

নানারূপ রঞ্জনপ্রণালী বেলুচিস্থান কিংবা মেসোপটেমিয়াতেও ছিল; কিন্তু এই বর্ণবিন্যাস ঐ সব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আর মাটী পোড়াইয়া কাচের মত করিয়া বর্ণবিন্যাস-প্রণালী মোহেন্-জো-দড়োর যুগে পৃথিবীর অন্য কোথায়ও জ্ঞাত ছিল না। কাচবৎ মাটীর উপর নিপুণ রঞ্জন-কৌশল ঐ যুগে একমাত্র সুসভ্য সিন্ধুতীর-বাসীদেরই জানা ছিল। সেইজন্য ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

অন্যান্য গৃহসামগ্রীর মধ্যে টাকুয়া বা টেকো (শঙ্খ, ফায়েন্স ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত), গাত্রমার্জ্জনী (flesh rubber), কুম্ভকারের পিটনী (dabber), পিঠার ছাঁচ, ঢাকনা ও পুতুল দেখিতে পাওয়া যায়। সূচ, চুলের কাঁটা, চিরুনি, অঞ্জন-শলাকা ও গৃহের সাজসজ্জার উপকরণ প্রভৃতির জন্য হাড়, শাঁখ ও হাতীর দাঁত; এবং মূল্যবান্ বাসন-কোসন, কুঠার, করাত, ছুরী, বাটালি, ক্ষুর, চুলের কাঁটা, সূচ, বেধনী (awl) ও বড়্‌শি প্রভৃতির জন্য তামা ও ব্রোঞ্জ্ ব্যবহার করা হইত। বড়লোকের বাড়ীতে কাঠের কিংবা বেতের চেয়ার এবং টেবিল ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ সৈন্ধবলিপির মধ্যে শ্রীযুক্ত স্মিথ্ ও গ্যাড্ উক্ত উভয় চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। শিশুদের খেলনার মধ্যে ঝুমঝুমি, বাঁশী, পাখীর খাঁচা, স্ত্রী-পুরুষের মূর্ত্তি, পশুপক্ষী ও গাড়ী প্রভৃতি সামগ্রী উল্লেখযোগ্য। ঐগুলি পোড়া মাটীর তৈরী। 'মৃচ্ছকটিকা' বা মাটীর গাড়ী সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ইহা ভারতীয় চক্রযানের প্রথম নিদর্শন। এইরূপ গাড়ী উর-এর (Ur) (মেসোপটেমিয়া ৩২০০ খ্রীঃ পূঃ) এক প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত আছে। প্রাচীন অনাউ-এর (Anau) চক্র

চতুষ্টয়-যুক্ত এক "মৃচ্ছকটিকায়"ও (wagon) এইরূপ নমুনা দেখা যায়। মোহেন্-জো-দড়োর মাটীর গাড়ীর সঙ্গে আধুনিক সিন্ধুদেশীয় যানের, এবং হরপ্পার তাম্রনির্ম্মিত ক্রীড়াশকটিকার সঙ্গে তত্রত্য এক্কার কোন প্রভেদ দেখা যায় না। খেলার জন্য তাহারা শক্ত ও নরম পাথরের ছোট গুলি (মার্‌বল) এবং পাশা [১] (অক্ষ) ব্যবহার করিত।

আজকাল ভারতবর্ষে লম্বাধরণের যে পাশা দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ পাশাগুলি ঠিক সেরূপ নয়। অনেকটা আধুনিক বিলাতী পাশার মত। মাটী, শাঁখ ও পাথরের তৈরী ছোট শিবলিঙ্গের মত অসংখ্য দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি পাশা কিংবা দাবা জাতীয় খেলার [২] গুটিকারূপে ব্যবহৃত হইত

[১] বেদেও অক্ষ বা দ্যূত ক্রীড়ার ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে বর্ণিত অক্ষ বিভীতক-দ্বারা তৈরী হইত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত অক্ষ বা পাশা, পাথর কিংবা পোড়া মাটীর তৈরী। ইহারা প্রায়শঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় সমান। 'দান' গণনার জন্য ইহার ছয় দিকে এক হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত থাকিত। বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োবাসীদের অক্ষক্রীড়া বিষয়ে সাম্য দেখা গেলেও উভয়ের অক্ষের আনুষঙ্গিক উপাদানে এবং ক্রীড়া-প্রণালীতে কোন পার্থক্য ছিল কিনা বলা কঠিন।

[২] প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে "চতুরঙ্গ" ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। ইহা বোধ হয় পাশা-যুক্ত দাবা খেলারই নামান্তর। ইহাতে যুদ্ধের অনুকরণে উভয় পক্ষে গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারি-অঙ্গ-বিশিষ্ট সৈন্য লইয়া খেলা হইত। এই খেলার ছকের নাম ছিল 'অষ্টাপদ'; কারণ ঐ ছকে প্রতি দিকে আটটী করিয়া সমগ্রে (৮×৮) চৌষট্টিটী ঘর থাকিত, মোহেন্-জো-দড়োতে খেলার ছক আধুনিক দাবা বা শতরঞ্জ খেলার ছকের মত ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ মৃৎপাত্রের গায়ে দাবার ছকের অনুকরণে চতুষ্কোণ ঘর অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলির মধ্যে অবিকল আধুনিক ছকের মত পর্য্যায়ক্রমে সাধারণতঃ একটী সাদা ঘরের পর একটী ঘর চিত্রিত রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের চতুরঙ্গ খেলার বিষয় 'চতুরঙ্গ-দীপিকা' নামক সংস্কৃতগ্রন্থে বর্ণিত আছে। উক্ত পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আবার স্যর্ জন্ মার্শাল্ মনে করেন মূলতঃ ঐগুলি বড় বড় শিবলিঙ্গের ক্ষুদ্র সংস্করণ, এবং শরীরে মাদুলির মত ব্যবহৃত হইত।[১]

শিল্প ও ললিতকলা—

শিল্প ও ললিতকলার যদিও প্রচুর উপাদান এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই তথাপি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্র এবং খেলনা প্রভৃতি হইতে ইহার একটু আভাস পাওয়া যায়। সিন্ধুতীর-বাসীদের ঘরগুলি খুব সাদা-সিধে ধরণের ছিল। তবে আভিজাত্য-সূচক স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও সন্তরণ-বাপী প্রভৃতি ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য সূতার কাপড়, মাথার ফিতা, গলার হার, গায়ের শাল, হাতের চুড়ি ও আংটী ব্যবহৃত হইত।

নানারূপ কারুকার্য্যপূর্ণ গজদন্ত, অস্থি ও শঙ্খ-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ ও নলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কাঠী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির কোন কোনটী দেখিতে বর্ত্তমানে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে প্রচলিত অস্থি-নির্ম্মিত পাশার মত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত কাঠীর বিভিন্ন তলদেশে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের পরিবর্ত্তে একই নমুনা থাকায় ঐগুলিকে পাশা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। ঐগুলি বোধ হয় গৃহের সজ্জাদ্রব্য-রূপে ব্যবহৃত হইত।

সিন্দুক, পেটিকা ও অন্যান্য মনোরম কাষ্ঠ-দ্রব্যাদি খচিত করিবার জন্য শঙ্খ, শুক্তি, অস্থি ও গজদন্তের বৃত্ত, অর্দ্ধবৃত্ত, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, আয়ত, তির্য্যগ্-আয়ত, যব এবং পত্রাদির

[১] M. I. C., Vol I, p. 89.

আকৃতি-বিশিষ্ট অনেক মসৃণ ছোটখাটো জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছে। অলঙ্কার-পত্র জড়োয়া করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নানারূপ সুন্দর সুন্দর জিনিসও পাওয়া গিয়াছে। এই সব দ্রব্যে সিন্ধুতীর-বাসীদের অত্যন্ত মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাস্কর-বিদ্যা—

ভাস্কর-বিদ্যায়ও যে তাম্রপ্রস্তর যুগের সিন্ধু-পত্যকাবাসীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা চূণা পাথরের ত্রিপত্র-যুক্ত উত্তরীয়-ধারী বৃহৎ যোগিমূর্ত্তি, উত্তরীয়-পরিহিত ধ্যানিমূর্ত্তি, শ্মশ্রু ও কবরী-বিশিষ্ট মস্তক এবং বৃষমূর্ত্তি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

লিপি—

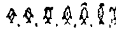
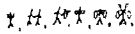
সিন্ধু-পত্যকার অক্ষর-মালা নানা প্রাণী ও বস্তু চিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শীলমোহর অক্ষর-পঙ্ক্তিতে মনুষ্য (যষ্টিধারী, ভারবাহী, তীর-ধনুকধারী, শৃঙ্খলিত, মল্ল ক্রীড়ারত চক্রারোহী প্রভৃতি), মৎস্য, হংস পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পাতা, যব, চেয়ার, টেবিল, তীর, ধনুক, চক্র, মন্দির প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখার গতি বাস্তব চিত্র হইতে অবাস্তব ও সরল চিহ্নের দিকে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ সময়কার আদি-এলাম (Proto-Elamitic), প্রাচীন সুমের, ক্রীত্ (Crete) ও মিসরের চিত্র-লিপির সঙ্গে এই স্থানের লেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পোলিনেশিয়ার (Polynesia) ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ড্ (Easter Island) নামক দ্বীপের লেখার সঙ্গে এখানকার শতাধিক অক্ষরের হুবহু মিল আছে বলিয়া ইদানীং হঙ্গেরীয়

লেখক শ্রীযুক্ত হেভেশি (Hevesy) মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১] ইষ্টার্ আয়্ল্যাণ্ড্-(Easter Island)এর অক্ষর কাষ্ঠফলকের উপর ক্ষোদিত রহিয়াছে। কবে কাহার দ্বারা এই সব ক্ষোদিত হইয়াছিল কেহই কিছু বলিতে পারে না। তত্রত্য আধুনিক অধিবাসীরা ঐ অক্ষরের অণুমাত্রও বুঝিতে পারে না বলিয়া উক্ত লেখক মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। এত দূরবর্ত্তী স্থানদ্বয়ের লেখার এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের কোন সন্তোষজনক কারণ আজ পর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; তবে ইষ্টার্ আয়্ল্যাণ্ড্-(Easter Island)এর কাষ্ঠফলকের লেখা কয়েক শতাব্দীর বেশী প্রাচীন হইবে না। পক্ষান্তরে মোহেন্-জো-দড়োর লেখা পাঁচ হাজার বৎসরেরও বেশী পুরাতন। এত দীর্ঘকাল পরে ইষ্টার্ আয়্ল্যাণ্ডে (Easter Island) সিন্ধুতীরের অক্ষরমালার প্রচলন দেখিতে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভাবিবার বিষয়। মোহেন্-জো-দড়োর লেখা চিত্রমূলক হইলেও ইহাতে প্রকৃত চিত্র খুব অল্পই দেখা যায়; মৎস্য, মনুষ্য ও তীর-ধনুক, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি ছাড়া অন্য চিত্র বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। লিপিকুশলতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট দেখা গেলেও মেসোপটেমিয়ার কীলকাকৃতি লিপির মত একেবারে অচলপ্রতিষ্ঠ (stereotyped) হয় নাই। এখানকার লেখা পাথরের শীল-মোহরে, তামার বা ব্রোঞ্জের ফলকে ও পোড়া মাটীর উপর শীলমোহরের ছাপে এবং মৃন্ময়পাত্রের গায়ে

[১] "Sur une E'criture océanique paraissant d' Origine néolithique," par M. G. de Hevesy. Extrait du Bulletin de "Societé Prehistorique," Française, Nos. 7-8, 1933.

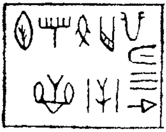
দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পাতে এই সকল বস্তু ও শক্ত চক্চকে মাটীর (vitrified clay) বলয়ে এই লেখা অঙ্কিত রহিয়াছে।

মেসোপটেমিয়ার মত এখানে মৃৎফলকে চিঠিপত্র ও দলিল লেখা হইত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে সম্ভবতঃ দৈনন্দিন লেখার জন্য ভোজপাতা (ভূর্জ্জপত্র), তাল-পাতা অথবা ইষ্টার্ আয়ল্যাণ্ডের মত কাঠ ব্যবহৃত হইত। এইগুলির প্রচলন থাকিলে সময়ের আবর্ত্তনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

শ্রীযুক্ত সিড্নী স্মিথ্ এবং শ্রীযুক্ত গ্যাড্ মোহেন্-জো-দড়োর অক্ষরমালায় ৩৯৬টী চিহ্ন রহিয়াছে বলিয়া তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল তাহা বলা যায় না। এই লেখার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই একটী মূল চিহ্নকে সামান্য পরিবর্ত্তন-দ্বারা স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যথা—এক মৎস্য চিহ্ন হইতে  ইত্যাদি চিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শীলমোহরের লেখায় সংযুক্ত বর্ণ আছে বলিয়া মনে হয়, যেমন  ইত্যাদি একই নরচিহ্ন হইতে অন্যান্য চিহ্ন বা অক্ষরের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থানে স্থানে অক্ষরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখা দেখা যায়। স্বরবিন্যাস বা উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত ঐগুলির প্রয়োগ হইত বলিয়া মনে হয়। এই যুগের অন্যান্য দেশের লেখায়ও এই সংযোগ ও রূপান্তর-বিধান অল্প-বিস্তর দেখা যায়। কোন কোন শীল মোহরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র রেখা ক্ষোদিত রহিয়াছে। ঐগুলি ঊর্দ্ধসংখ্যায় বারটী পর্য্যন্ত দেখা

যায়। কেহ কেহ মনে করেন ঐগুলি সংখ্যাজ্ঞাপক কিন্তু স্যর্ জন্ মার্শাল্ এই সকলকে সংখ্যা-জ্ঞাপকের পরিবর্ত্তে ধ্বনিসূচক বলিয়া মনে করেন।[১] এই স্থানের লেখা সাধারণতঃ ডান হইতে বাম দিকে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সময়ে সময়ে এক পঙ্‌ক্তি ডান হইতে বাম এবং তৎপর বাম হইতে আরম্ভ করিয়া ডান দিকে লিখিত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] হরপ্পায় কাল মর্ম্মরের একটী শীলমোহরে তিনটী কিনারায় লেখা রহিয়াছে; প্রথমতঃ ঐ শীল মোহরের উপরের দিকে বাম হইতে ডান সীমার শেষ পর্য্যন্ত এক পঙ্‌ক্তি লিখিত হইয়াছে। তারপর সেই লেখা বাদ দিয়া দ্বিতীয় পার্শ্ব ঘুরাইয়া বাম হইতে ডান দিকে পঙ্‌ক্তি আরম্ভ করিয়া শেষ সীমায় পুনরায় ইহার তৃতীয় পার্শ্ব ঘুরাইয়া বাম হইতে ডান দিকে লেখা হইয়াছে, যথা—



শীলমোহরের লেখা উল্টাভাবে ক্ষোদিত হইয়া থাকে সুতরাং শীলমোহরে বাম হইতে লেখা থাকিলে ছাপ দিলে ইহা ডান হইতে বাম দিকে পড়িতে হইবে। এই লেখায় যে রীতিমত একটা বর্ণমালার উদ্ভব হয় নাই ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়া থাকিলে এত অসংখ্য চিহ্নের আবশ্যকতা হইত না। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনিব্যঞ্জক (phonetic) আর কতকগুলি ভাবব্যঞ্জক (ideogram) বলিয়া অনুমিত হয়।

১ M. I. C., Vol. I, p. 40
২ M.I.C., Vol. III, Pl. CIX, Seal No. 247.

এখানকার অক্ষরের সঙ্গে প্রাচীন সুমেরীয় (Sumerian), আদিম এলাম-বাসী, প্রাচীন ক্রীত্‌দ্বীপবাসী এবং হিট্টাইট্‌ (Hittite) জাতির চিত্রাক্ষরের যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পোলিনেশিয়ার অন্তর্গত ইষ্টার্‌আয়্‌ল্যাণ্ডের কাষ্ঠফলকাঙ্কিত অক্ষর এবং চীন দেশের চিত্রাক্ষরের সঙ্গেও মোহেন্‌-জো-দড়োর অক্ষরের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় উল্লিখিত নানাপ্রকার লেখার এবং মোহেন্‌-জো-দড়োর লেখার মূল হয়ত একই ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ইহা হইতে স্ব স্ব ভাষা প্রকাশের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজের আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা স্বীয় বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছে। অধ্যাপক লাঙ্গ্‌ডন্‌ (Langdon) মনে করেন, মোহেন্‌-জো-দড়োর অক্ষর হইতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং উভয় অক্ষরের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য যে আছে ইহাও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহুবৎসর পূর্ব্বে স্যর্‌ আলেক্‌জেণ্ডার্‌ ক্যানিংহাম্‌ এই চিত্র-লিখন হইতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বপ্রথম অনুমান করেন।[১] সিন্ধুতীরের অক্ষরের মধ্যে সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার ও উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ চিহ্নাদির প্রয়োগ হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইগুলি পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মী অক্ষরের চিহ্নের মতই, ইহা দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। তবে উভয়বিধ অক্ষরের মধ্যে উচ্চারণের কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা সিন্ধুলিপি পঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বলা অসম্ভব। পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্‌-জো-দড়োর ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কোন সম্পর্ক

১ Corp. Ins. Ind., Vol. I, p. 52.

নাই; কারণ সিন্ধু-সভ্যতা প্রাগ্‌বৈদিক; সুতরাং ভাষাও প্রাগ্‌বৈদিক। এই ভাষা হয়ত প্রাচীন দ্রাবিড়জাতীয়; কারণ কেহ কেহ অনুমান করেন, বৈদিক ঋষিদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে উত্তর-ভারতে দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী লোক বাস করিত এবং সম্ভবতঃ মোহেন্-জো-দড়োর এই অত্যুন্নত সভ্যতা তাহাদেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ।

দ্বিতীয়তঃ সিন্ধুদেশের অনতিদূরে বেলুচিস্থানে ব্রাহুই (Brahui) জাতির বাস; ইহাদের মধ্যে এখনও দ্রাবিড়ী ভাষার প্রচলন আছে। তাহাতে অনুমান হয় সিন্ধুপ্রদেশের অন্যান্য স্থানের দ্রাবিড়ী ভাষা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহুই-দের মধ্যে ইহা চিহ্ন-স্বরূপ বাঁচিয়া আছে। অধিকন্তু দ্রাবিড়ী ভাষা সংযোগমূলক (agglutinative) এবং সুমের-বাসীদের ভাষাও সংযোগমূলক। কাজেই কেহ কেহ মনে করেন সুমেরের সংযোগমূলক ভাষার সাহায্যে সিন্ধু-সভ্যতার ভাষার রহস্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা হয়ত বা ফলবতী হইতে পারে। যেহেতু এই উভয় জাতির মধ্যে অনেক বিষয়েই কৃষ্টিসাম্য বিদ্যমান ছিল, সুতরাং ভাষাসাম্যের কল্পনা একেবারে অলীক না-ও হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্তই অনুমানমাত্র। ইহাতে কোন সত্য নিহিত না-ও থাকিতে পারে। আবার কেহ কেহ সংস্কৃত পুরাণাদিতে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ বীর ও দেবগণের নাম বাহির করিয়া শীলমোহরের লিপির ব্রাহ্মী বর্ণমালার সঙ্গে মিল রাখিয়া পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।[১] এই চেষ্টায় এখনও কেহ সফলকাম

১ Langdon, M. I. C., Vol. II, p. 431.

হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে অক্ষরের ধ্বনি ঠিক হইবে এবং সহজেই ভাষাও ধরা পড়িবে।

নর-কঙ্কাল—

মোহেন্-জো-দড়োতে খননের পর নানা স্থানে গৃহাভ্যন্তর ও রাজপথ হইতে কয়েকটী নরকঙ্কাল ও নরকপাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্যর্ জন্ মার্শাল্-সম্পাদিত সুবৃহৎ পুস্তকে ঐগুলির সংখ্যা সর্ব্বসমেত ছাব্বিশটী বলিয়া ডাঃ গুহ এবং কর্ণেল্ স্যুয়েল্ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক লেখার পর আরও কয়েকটী নর-কঙ্কাল ও নর-করোটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উভয় সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে মোহেন্-জো-দড়োতে চারি জাতীয় লোকের বাস ছিল, যথা—(১) ককেশীয়[১] (Caucasic), (২) ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean), (৩) আল্পীয় (Alpine) এবং (৪) মোঙ্গোলীয় (Mongolian)। এই বিষয়ে পরে বিষদভাবে আলোচনা করা যাইবে।

জীব-জন্তুর অস্থি—

জীবজন্তুর মধ্যে কুকুরের মাথা ও হাড় পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষা-দ্বারা জানা গিয়াছে, মোহেন্-জো-দড়োর কুকুর ও তুর্কীস্থানান্তর্গত প্রাচীন আনাউ-নগরের কুকুরের মধ্যে জাতি-সাম্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

কাল ইঁদুর, অশ্ব[২] (পরবর্ত্তী কালের) ও হস্তী প্রভৃতির অস্থি

[১] Census of India, 1931, Part III, pp. lxviii-lxix.—Guha. পূর্ব্বে ডাঃ গুহ এবং কর্ণেল্ স্যুয়েল্ এই ককেশীয় জাতিকে আদি-অষ্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) আখ্যা দিয়াছিলেন।—M. I. C., Vol. II, pp. 638 f.

[২] আনাউ-নগরে প্রাপ্ত অশ্বের সঙ্গে এই অশ্বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ডাঃ গুহ এবং কর্ণেল স্যুয়েল্ অনুমান করেন।—M. I. C., Vol. II, p. 658.

ও কঙ্কাল এবং ককুদ্বান্ ও অন্য জাতীয় বৃষের অস্থি, কঙ্কাল ও শৃঙ্গ, চারি জাতীয় হরিণের শৃঙ্গ, উষ্ট্রের ছিন্ন কঙ্কাল, শূকর, গৃহপালিত কুক্কুট, ঘড়িয়াল কুমীর প্রভৃতিরও অস্থি, দন্ত ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সময় ও অধিবাসী

আদিম যুগের মানুষ প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র ব্যবহার করিত। এই ব্যবস্থা বহু সহস্র বৎসর চলিল, ক্রমে মানুষের শিল্প ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাথর পালিস করিয়া ঐ সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে শিখিল। তারপর তামা, ও তামা গলাইয়া দ্রবাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইল। এই তামা দিয়া যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, আহারের বাসন-কোসন, প্রসাধনের ও সাজসজ্জার সামগ্রী প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যের অনুকরণেই প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রস্তর দৈনন্দিন ব্যবহার হইতে একেবারে লোপ হয় নাই অথচ তামার প্রচলন আস্তে আস্তে বাড়িয়া চলিয়াছে, এইরূপ সময়কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা "তাম্র-প্রস্তর যুগ" (Chalcolithic Age) আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইজিপ্ত, মেসোপটেমিয়া, ক্রীত্, পারস্য প্রভৃতি দেশ প্রাচীনতায় মোহেন্-জো-দড়োর প্রায় সমসাময়িক ও সভ্যতায় সমকক্ষ। উল্লিখিত দেশসমূহও খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রকে তাম্রপ্রস্তর যুগের উন্নত প্রণালীর সভ্যতায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; যথা—নাগরিক জীবনের উন্মেষ,

অস্ত্রশস্ত্র, বাসন-কোসন ও হাতিয়ার নির্ম্মাণের জন্য তামা ও ব্রোঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের প্রস্তরেরও অল্প-বিস্তর ব্যবহার; কুম্ভকারেরমৃচ্চক্রের আবিষ্কার ও তদ্দ্বারা উন্নত প্রণালীর মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ; যাতায়াতের জন্য চক্রযানের আবিষ্কার; পোড়া ইট ও শুষ্ক ইটের দ্বারা বন্যার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চের উপর গৃহনির্ম্মাণ; লেখা-দ্বারা ভাব-প্রকাশের জন্য চিত্রাক্ষর-প্রয়োগ; শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য শেল (বর্শা), ছোরা, তীর ও ধনুক প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর কিংবা ধাতুনির্ম্মিত মুষলের ব্যবহার, ফায়েন্স (faiencé), শঙ্খ (shell) ও নানারূপ প্রস্তর-দ্বারা গহনা-নির্ম্মাণ; স্বর্ণকার-রৌপ্যকার প্রভৃতি শিল্পীর ব্যবসায়ের উন্নতি ইত্যাদি বিষয় তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার সাধারণ প্রতীক বলিয়া সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন দ্রব্য পরীক্ষা করিলেও দেখা যায় যে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর সমৃদ্ধির সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রকের শেষ ভাগে এলাম (প্রাচীন পারস্য), মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধুপত্যকার মধ্যে যেন একটা জীবন্ত আদান-প্রদানের ভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের মধ্যেও যেন মোহেন্-জো-দড়োর গৌরব ও বিশেষত্বটা বেশী ছিল। এখানকার মত এত চমৎকার গৃহ অন্য কোথাও দেখা যায় না; এখানে যে স্নানাগার আছে এইরূপ স্নানাগারও এত প্রাচীন কালে অন্য কোন স্থানে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখানকার শিল্প, সমসাময়িক ইজিপ্ত, সুমের ও এলাম প্রভৃতি দেশের শিল্পাপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। মোহেন-জো-দড়োর মৃৎপাত্র-চিত্রও তুলনাহীন। সাধারণ বয়ন-কার্য্যের জন্য ইজিপ্তে প্রচলিত শণ-জাত সূতার

পরিবর্তে এখানে তুলার সূতা ব্যবহৃত হইত। অধিকন্তু এখানকার লেখার সঙ্গে অন্যান্য দেশের প্রাচীন লেখার দৃষ্টতঃ মোটামুটি সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা যে অতিশয় উন্নত প্রণালীর লেখা এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মোহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপ-খননের পর একে একে পর পর সাতটী স্তরের চিহ্ন ও দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরের তিন স্তর তৃতীয় যুগের (Late period), তন্নিম্নের তিন স্তর মধ্যযুগের (Intermediate period) এবং ইহার নীচের একটী আদি যুগের (Early period) বলিয়া মিঃ ম্যাকে অনুমান করেন।[১] ইহার নীচে আরও আদিযুগের স্তর আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ অপেক্ষা ভূগর্ভস্থ জল (water level) বর্ত্তমানে অনেক উপরে উঠিয়া আসায় সর্ব্বপ্রাচীন স্তরের সন্ধান ও আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য দেশ হইলে এই সাত স্তরের বিভিন্ন সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির জন্য অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর লাগিত। কিন্তু দীর্ঘ দশ শতাব্দী স্থায়ী সভ্যতা এখানে ছিল বলিয়া অনুমান হয় না। কারণ এখানে ঘন ঘন জলপ্লাবনের জন্য এক যুগের (বা স্তরের) সভ্যতা বহু বৎসর ব্যাপিয়া স্থায়ী হয় নাই। এই নগর বন্যা-দ্বারা প্রায়ই বিধ্বস্ত হইত। স্থানে স্থানে বন্যা-বাহিত নদী-সৈকতের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই অনুমান যে সত্য ইহার কারণ এই যে, প্রাচীন দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সাতটী স্তরে পাওয়া গেলেও দেখিতে অবিকল একই রকম। ইটের আকার ও মাপ, শীলমোহরের

[১] Arch-Sur. Ref., 1928-29, pp. 68-69.

লেখা ও আকৃতি প্রভৃতির মধ্যে উপরের স্তর ও নীচের স্তরের সভ্যতার কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মৃৎপাত্রাদিতেও স্তরের বিভিন্নত্বের জন্য আকৃতি ও চিত্রের কোন প্রভেদ দেখা যায় না।[১]

উপরের এবং নীচের স্তরের সমস্ত জিনিষের মধ্যে এরূপ সাধারণ ঐক্য-দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে মোহেন্-জো-দড়োর পত্তন এবং পতনের মধ্যে মাত্র কয়েক শতাব্দীর বেশী ব্যবধান নয়। স্যর্ জন্ মার্শাল্ এই ব্যবধান-কাল পাঁচ শত বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। এই সহর-প্রতিষ্ঠার সময়েই যে তত্রত্য অধিবাসীদের অত্যন্ত উন্নতপ্রণালীর সভ্যতা ছিল, ইহা জোর করিয়া বলা যায়। নাগরিক জীবনের জটিলতা, গৃহনির্ম্মাণে নিপুণতা এবং শিল্পকর্ম্মাদির উৎকর্ষ প্রভৃতি দ্বারা মনে হয়, এই সভ্যতা বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই সুরু হইয়াছিল এবং মোহেন্-জো-দড়োর পত্তন এই দীর্ঘকালেরই ক্রমোন্নতির ফলস্বরূপ। নানা প্রকার মৃৎপাত্র, গভীর ভাবে অঙ্কিত মনোরম চিত্রযুক্ত শীলমোহর এবং ইহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর লেখা প্রভৃতিও এই সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস বহন করিয়া আনিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োর পতনের পরেও এখানকার শিক্ষা-দীক্ষা বহু দিন পর্য্যন্ত সজীব

১ পোড়া মাটীর পুতুলগুলির মধ্যে মাত্র একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। অনেক বিষয়ে উপর ও নীচের স্তরের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্য থাকিলেও নীচের পুতুলগুলি খুব স্বাভাবিক, এবং শিল্পীর পরিপক্ব হস্তের পরিচায়ক। উপরের পুতুল স্বাভাবিকত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনা হিসাবেই তৈরী হইত। মূল জিনিসের আভাস ইহাতে থাকুক আর না থাকুক শিল্পীর তাহাতে কোন মনোযোগ নাই। এইখানেই নগরের অধঃপতনের সূচনা দেখা যায়।

ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, হরপ্পায় উপরের স্তরে মোহেন-জো-দড়ো-যুগের পরবর্ত্তী কালের সমাধি-দ্রব্য ও পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি যদি সিন্ধু-সভ্যতার প্রতীক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে পরবর্ত্তী কালেও যে এই সভ্যতার ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

মোহেন্-জো-দড়ো ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ—

মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের মত ঠিক একই রকম পাঁচটী শীলমোহর মেসোপটেমিয়া ও এলামের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির অন্ততঃ দুইটী মেসোপটেমিয়ার সার্গোন (Sargon) (খ্রীঃ পূঃ ২৮শ শতাব্দী) নামক রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের, অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রকের বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

মেসোপটেমিয়ার উর (Ur) এবং কিশ্ (Kish) নামক স্থানদ্বয়ে প্রাপ্ত শীলমোহর দুইটী হইতেও সিন্ধু-সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ মোহেন-জো-দড়োর স্থিতিকাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২৭৫০ অব্দ বলিয়া মনে করেন। উল্লিখিত পাঁচটী শীলমোহরের একটী সুসা (এলাম) নামক সহরের দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া গিয়াছে। ইহা অস্থিনির্ম্মিত ও দেখিতে নলের মত। ইহাতে মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের অনুকরণে "বৃষ এবং পাত্র"-চিহ্ন আছে। ইহাতে অনুমান হয় মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহর-অঙ্কনের প্রভাব সুসার দ্বিতীয় যুগের অধিবাসীদের

নিকট পৌঁছিয়াছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তাৎকালিক ভারতের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, মেসোপটেমিয়ার আল-উবৈদ্ (Al-ubaid) নগরে প্রাপ্ত কয়েকটী পাত্রখণ্ড ভারতীয়-প্রস্তরনির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ এখানে প্রাপ্ত একটী মূর্ত্তির গাত্রাবরণে অঙ্কিত "ত্রিপত্র"-(trefoil) চিহ্ন [১] এবং সুমেরে প্রাপ্ত "স্বর্গবৃষের" (Bull of Heaven) গাত্রাঙ্কিত ত্রিপত্র-চিহ্ন একই রকম। তৃতীয়তঃ মোহেন-জো-দড়োর শীলমোহরের শৃঙ্গি-মূর্ত্তি [২] সুমেরুবাসীদের শৃঙ্গযুক্ত "ইয়বনি" (Eabani) দেবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরপ্পায় আবিষ্কৃত কয়েকটী প্রসাধন-দ্রব্য এবং উর নগরীয় প্রথম রাজবংশের গোরস্থান হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মোহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত কতকগুলি লাল আকীক পাথরের মালার ও সাৰ্গোন্ রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কিশ্-নগরীয় গোরস্থানের কোন কোন মালার নির্ম্মাণ-কৌশল অবিকল একই রকমের। অধিকন্তু উভয় স্থানের পাথরের নলাকৃতি (cylindrical) ওজন এবং মাটীর উৎসর্গাধান (offering stand) প্রভৃতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিবাসী —

মোহেন্-জো-দড়োতে এক গলির মধ্যে ছয়টী এবং ঘরের ভিতরে চৌদ্দটী নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কোন মহামারী কিংবা আকস্মিক বিপদ্ই

[১] M. I. C., pl. XCVIII.
[২] M. I. C., pl. CXI. Seals 356 and 357.

ইহাদের মৃত্যুর কারণ। ভারতবর্ষে মৃতদেহ-সৎকারের প্রণালী কোন সময়েই এইরূপ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সকল এবং অন্যান্য কঙ্কাল ও মস্তক পরীক্ষার দ্বারা এখানে চারি জাতীয় লোক বিদ্যমান ছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের যে সব প্রদেশ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী, সেই সব স্থানে যে জাতীয় লোক বাস করে, মোহেন্-জো-দড়োতে তদনুরূপ লোক ছিল বলিয়া অস্থিকঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই আকৃতি-বিশিষ্ট লোক দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষীদের (যথা তেলেগু, মালয়ালম্ ভাষীদের) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালী জাতির মধ্যেও কথন কথনও এই নমুনার লোক দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহাদের অধিকাংশেরই মাথা চওড়ার অনুপাতে বেশী লম্বা। ইহাদের মাথার উপরিভাগ উন্নত, কপাল সমতল এবং নাসিকা অপ্রশস্ত ও উন্নত ছিল। ইহাদের লম্বা অস্থি দেখিয়া মনে হয়, ইহারা নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব্ব আকার-বিশিষ্ট ছিল।

দ্বিতীয় প্রকারের মস্তক আয়তনে বৃহৎ ও অনুন্নত, অক্ষি-পুটের উপরিস্থিত (অর্থাৎ ভ্রূর নিম্নস্থ) অস্থি উন্নত, এবং কানের পশ্চাদ্ভাগে মস্তকের (করোটীর) অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ললাট অনুন্নত ও নাসিকা অনতিপ্রশস্ত। ইহাদিগকে প্রথমে আদি-অষ্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) বলিয়া কর্ণেল্ স্যুয়েল্ ও ডাঃ গুহ বর্ণনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি ডাঃ গুহ এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট লোককে অষ্ট্রেলীয় জাতির অন্তর্ভূত

না করিয়া ককেশীয় (Caucasic) জাতি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

উল্লিখিত দুই প্রকার লম্বা-মস্তক-বিশিষ্ট জাতি ছাড়া এখানে প্রশস্ত-মস্তক-বিশিষ্ট আরও একপ্রকার জাতির বাস ছিল। ইহাদের মস্তকের শীর্ষদেশ উন্নত, মস্তক সুবৃহৎ, অক্ষিপুটের অস্থি সামান্যভাবে উন্নত এবং নাসিকা অপ্রশস্ত ও উন্নত ছিল। এই জাতীয় লোক এশিয়া মহাদেশের আর্ম্মেনিয়া হইতে পামীর বা কাশ্মীরের উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বেলুচিস্থান প্রভৃতি প্রদেশেও অধিকসংখ্যক দেখা যায়।

উল্লিখিত তিন প্রকার জাতি ব্যতীত মোঙ্গোলীয় জাতীয় একটি নরমুণ্ডও এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত একটি নাগা-মুণ্ডের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলিয়া বিবিধ পরিমাপ-দ্বারা কর্নেল্ স্যুয়েল্ ও ডাঃ গুহ প্রমাণ করিয়াছেন।

বেলুচিস্থানের নাল এবং পাঞ্জাবের হরপ্পা প্রভৃতি স্থানেও তাম্র-প্রস্তর-যুগের মোহন্-জো-দড়ো-বাসীর তুল্য কোন কোন জাতির বাস ছিল বলিয়া সেই সকল স্থানে আবিষ্কৃত অস্থি-কঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

এখানকার সভ্যতাসম্বন্ধে স্যর্ জন্ মার্শাল্ বলেন যে, ইহা হয়ত কোন জাতি-(race) বিশেষের সৃষ্টি নয়, প্রধানতঃ স্থান ও স্থানীয় নদীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিভিন্ন জাতির

[১] Census of India 1931, Part III, pp. lxviii-lxiv.

আহৃত উপাদান ও আনুকূল্যের দ্বারা এই বিরাট্ সভ্যতার পরিপোষণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।[১]

কেহ কেহ মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীদিগকে প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় (Dravidians) জাতি বলিয়া মনে করেন। কারণ, দ্রাবিড়ীয়েরা পশ্চিম হইতে আক্রমণকারিরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বলিয়া একটী মত আছে। এই অনুমানের মূলে কোন সত্য নিহিত থাকিলে এই বলা যাইতে পারে যে ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) জাতির যে সকল লোক কিশ্ (Kish), আনাউ (Anau), নাল (Nāl) এবং মোহেন্-জো-দড়োতে বাস করিত বলিয়া অনুমান করা যায়, ইহারা (Dravidians) হয়ত তাহাদেরই স্বজাতি এবং ভারতে প্রবেশ করিয়া নানাজাতির সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রভৃতি মেলামেশার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, সুমেরীয় জাতি ভারতীয় দ্রাবিড়দের সমজাতীয় এবং মেসোপটেমিয়ার পূর্ব্বদিকে কোন স্থানে বা সিন্ধুপত্যকায় ইহাদের পূর্ব্বাবাস ছিল।

কেহ কেহ মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদিগকে বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে একজাতিভুক্ত করিতে চাহিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে অন্যান্য অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। নরকঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা ইহার কোন সমাধান হয় না। পরন্তু আর্য্যদের সম্বন্ধে বেদে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় ইঁহারা প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন এবং কৃষিজীবী ছিলেন। নাগরিক জীবন-যাপন সম্বন্ধে কিংবা জটিল অর্থনীতি-বিষয়ে ইঁহাদের তেমন

[১] M. I. C., Vol. I, pp. 108-09.

পারদর্শিতা ছিল না। বৈদিক আর্য্যদের মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের মত বড় বড় পোড়া ইটের অট্টালিকা ছিল না; পরন্তু মনে হয়, ইহারা বাঁশ ও বেত প্রভৃতি দিয়া কুঁড়ে ঘর তৈরী করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। মোহেন্-জো-দড়োতে অনতি দূরে দূরে কূপ খনন করিয়া সহরবাসীদের জল-সরবরাহের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; স্নানাগার প্রস্তুত করিয়া দিয়া লোকের আধুনিক সভ্যতানুযায়ী স্বচ্ছন্দভাবে স্নানাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত; অসংখ্য পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া আবর্জ্জনা ও অপরিষ্কৃতজল নিকাশের দ্বারা সহরবাসীর স্বাস্থ্য-রক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল; বড় বড় রাস্তা প্রস্তুত করিয়া যানবাহনাদির চলাচলের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ইত্যাদি এবং আরও অনেক উন্নত প্রণালীর নাগরিক জীবনের বিকাশ মোহেন্-জো-দড়োর পুরাবস্তু (antiquity) পর্য্যালোচনা করিলে সম্যক্ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আর্য্যদের সম্বন্ধে বেদ সেরূপ কোন প্রমাণ বহন করিয়া আনে নাই। ধাতুর ব্যবহার-বিষয়ে বেদ এবং মোহেন্-জো-দড়োর মধ্যে অনেকটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োতে সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে। লোহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এখানে নাই। ঋগ্বেদেও সোনা, তামা বা ব্রোঞ্জের উল্লেখ আছে।

শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য বৈদিক আর্য্যরা তীর, ধনুক, বর্শা, ছোরা ও কুঠার এবং আত্মরক্ষার জন্য শিরস্ত্রাণ ও কবচ ব্যবহার করিতেন। মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরাও এক দিকে যেমন আর্য্যদের মত তীর, ধনুক, বর্শা, ছোরা এবং কুঠার ব্যবহার করিত, পক্ষান্তরে মিশর ও মেসোপটেমিয়া-

বাসীদের মত পাথর- কিংবা ধাতুনির্ম্মিত মুষলের ব্যবহারও জানিত। কিন্তু আত্মরক্ষার কোন সরঞ্জাম আজ পর্য্যন্ত মোহেন্-জো-দড়ো হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। ঋগ্বেদের আর্য্যরা মাংসাশী ছিলেন কিন্তু মৎস্য-ভক্ষণ-সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বেদে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। মৎস্য মোহেন্-জো-দড়ো বাসীদের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ এখানে মৎস্য-শিকারোপযোগী তামার অনেক বড়্‌শি পাওয়া গিয়াছে। জলচর জীবের মধ্যে আরও কোন কোন জীব ইহাদের খাদ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বেদে অশ্বের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ অশ্ব ব্যবহার করিতেন, সূর্য্যের বাহন অশ্ব, ইত্যাদি উল্লেখ আছে। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়ো বা হরপ্পায় প্রাগৈতিহাসিকযুগের অশ্বের কঙ্কাল[১] কিংবা প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই।

বেদে গোমাতার স্থান বহু উচ্চে, কিন্তু মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে ইহার পরিবর্ত্তে শীলমোহর ও খেলনা প্রভৃতিতে বৃষের প্রতি আকর্ষণই অতিমাত্রায় পরিস্ফুট। ব্যাঘ্রের বিষয়ে ঋগ্বেদে উল্লেখ নাই, আর হস্তীর কথা সামান্যই আছে। কিন্তু সিন্ধু-তীর-বাসীর নিকট এই উভয় জন্তুই পরিচিত ছিল। বেদে কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে অনেক মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব স্থানে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া, কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। বেদে স্ত্রীদেবতার স্থান পুংদেবতার নীচে;

[১] মোহেন্-জো-দড়োর উপরের স্তরে এক স্থানে অশ্বের কতকগুলি হাড় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এইগুলি আধুনিক কালের বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন।

এবং মাতৃকা (Mother Goddess)-পূজা কিংবা শিবপূজার উল্লেখ উক্তগ্রন্থে দেখা যায় না। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতায় শিবলিঙ্গ এবং মাতৃকাপূজার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। বৈদিক আর্য্যদের প্রতিগৃহে অগ্ন্যাধান করিয়া তাহাতে অগ্নির আহুতি দেওয়া হইত। কিন্তু মোহেন্-জো-দড়োতে অগ্নিকুণ্ডের চিহ্ন খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে "শিশ্নদেব" (লিঙ্গোপাসক)-দিগকে খুব নিন্দা করা হইয়াছে; কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ শিশ্ন-পূজা বলিয়া অনুমিত হয়।

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে দেখা যাইবে যে বৈদিক ও মোহেন্-জো-দড়োর সভ্যতার মধ্যে বিশেষ কোন ঐক্য নাই। তবে এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে হয়ত বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার জননী কিংবা ভগিনী। প্রথম মতের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, বেদে অশ্ব ও আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যদি বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু-সভ্যতার জননীই হয় তবে মোহেন্-জো-দড়োতে এই সব জিনিষের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় কেন? এবং যদি বৈদিক সভ্যতা পূর্ব্ববর্ত্তী হয় তবে প্রথমতঃ বেদে গোমাতার শ্রেষ্ঠত্ব, তারপর সিন্ধু-সভ্যতায় বৃষের প্রাধান্য, এবং পরবর্ত্তী যুগে আবার গোমাতার পূজার কারণ কি? মোহেন্-জো-দড়ো-যুগে মধ্যে একবার বৃষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হওয়ায় একটা সাধারণ গতির ব্যতিক্রম হয় না কি?[১] যদি প্রস্তর-যুগের পরে মোহেন্-

[১] বেদে সময় সময় বৃষভের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বীরদের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগের উজ্জয়িনী মুদ্রায় শিবের পার্শ্বে বৃষের আকৃতি রহিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মুদ্রার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

জো-দড়ো-যুগের পূর্ব্বে একটা বৈদিক যুগের কল্পনা করা যায় তবে ঐ বৈদিক যুগে নানারূপ ধাতুদ্রব্যের ব্যবহারের পর মোহেন্-জো-দড়োতে যে প্রস্তর-ধাতু-যুগ দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমস্যারই বা সমাধান কি প্রকারে হয়?

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে ভারতীয় আর্য্যরা সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক-সভ্যতা এই উভয়েরই স্রষ্টা, তাহা হইলেও আর এক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কারণ ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় যে, যে লোকেরা মোহেন্-জো-দড়োতে গগনস্পর্শী অট্টালিকায় নাগরিক জীবনযাপন করিতে জানিতেন, তাঁহারাই আবার বেদের যুগে গ্রামে বাঁশ-খড়ের ঘরে বসবাস সহ্য করিলেন? অথবা একদা শিবলিঙ্গ- এবং মাতৃকা-পূজা অভ্যাস করিয়া বেদের সময়ে ইহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় পরবর্ত্তী যুগে ইহার প্রবর্ত্তন করিলেন, অথবা একবার সিন্ধুদেশে কিংবা মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা বৈদিক-গ্রন্থে ঐ সব স্থানের কথা উল্লেখ করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন, ইহাই বা কি প্রকারে মানিয়া লওয়া চলে? উল্লিখিত কারণসমূহ হইতে দেখা যায় যে বৈদিক ও সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য প্রমাণ করা দুষ্কর। এই সব চিন্তা করিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ বলেন যে বৈদিক সভ্যতা উক্ত উভয়ের মধ্যে শুধু যে পরবর্ত্তী তাহা নয়, ইহা সম্পূর্ণ বিজাতীয় এবং স্বতন্ত্র।[১]

[১] M. I. C., Vol. I, pp. 111-12.

কিন্তু মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশে আবিষ্কৃত অসংখ্য ধ্বংসস্তূপের রীতিমত খনন ও প্রত্নসম্পদের আলোচনা না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদিক ও সিন্ধু-সভ্যতার পৌর্ব্বাপর্য্য ও সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। শীলমোহরের অক্ষরমালা-পঠনের দ্বারোদ্ঘাটন না হইলেও এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা অতীব দুরূহ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম

মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের প্রধান ধর্ম্ম যে কি ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ কিছু বলা সম্ভব নয়। এখানে যে সকল গৃহ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ঐগুলিকে দেবমন্দির কিংবা উপাসনালয় বলিয়া মনে করা অত্যন্ত কঠিন। প্রধানতঃ শীলমোহর ও তাম্রফলকে ক্ষোদিত ছবি এবং মৃন্ময়-, প্রস্তর- ও ধাতু-নির্ম্মিত-মূর্ত্তি প্রভৃতি হইতে এখানকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

মাতৃকা-মূর্ত্তি —

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ মূর্ত্তি বেলুচিস্থানেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানকার মূর্ত্তির আকৃতির মধ্যে প্রভেদ আছে। সিন্ধু্পত্যকা এবং বেলুচিস্থানের মৃন্ময়ী মূর্ত্তির মত অনেক মূর্ত্তি পারস্য, এলাম, মেসোপটেমিয়া, ট্রান্স্‌কাস্পিয়া, এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, পালেস্‌টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীত্‌, বল্‌কান-উপদ্বীপ এবং ইজিপ্ট্‌ প্রভৃতি স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি প্রত্যক্ষভাবে কোন এক সাধারণ ধর্ম্ম হইতে উপজাত না হইলেও বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর ধর্ম্মের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা

যাইতে পারে। মাতৃকা- বা প্রকৃতি-পূজার সূত্রপাত প্রথমে অ্যানাটোলিয়া-য় (Anatolia) হইয়া সমস্ত পশ্চিম-এশিয়ায় বিস্তারলাভ করে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সিন্ধুপত্যকার মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় পশ্চিম-এশিয়ার মত ইহারাও ব্রত-উপলক্ষে নির্ম্মিত মাতৃকা কিংবা প্রকৃতি দেবীর মূর্ত্তি; অথবা বাড়ীর দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত কোন দেবী-মূর্ত্তি। এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ এই যে তাম্রপ্রস্তর-যুগের সভ্যতায় উদ্ভাসিত সিন্ধুনদের তীর হইতে আরম্ভ করিয়া নীল নদের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মূর্ত্তির প্রচলন দেখা যায়। পশ্চিম-এশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু হরপ্পা, মোহেন্-জো-দড়ো ও বেলুচিস্থান হইতেই ইহারা যে মাতৃকা-মূর্ত্তি কিম্বা মাতৃকাস্থানীয় অন্য কোন প্রতিমূর্ত্তি (অভিব্যক্তি) ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, ভারতবর্ষে মাতৃকা-মূর্ত্তির পূজা যেরূপ প্রাচীন ও সর্ব্বব্যাপী, পৃথিবীর অন্যত্র সেরূপ আর দেখা যায় না। ইনিই সম্ভবতঃ মাতা কিংবা মহামাতা এবং "শক্তি" বা প্রকৃতি দেবীর আদি অবস্থা। গ্রাম্য-দেবতারা হয়ত ইঁহারই অভিব্যক্তি। এই গ্রাম্য-দেবতাদের প্রতিষ্ঠান কোন পাথরে, কিংবা বৃক্ষে, অথবা সময় সময় লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত শূন্য গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম-এশিয়ার মত এই দেশেও সামাজিক জীবনে মাতৃজাতির প্রাধান্যের সময় এই মাতৃকা-পূজার সূত্রপাত হয় এবং এতদ্দেশীয় অনার্য্যদের জাতীয় দেবতামণ্ডলীর মধ্যে এই পূজার অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

ভারতীয় কিংবা অন্য দেশের আর্য্যদের মধ্যে কোন

স্ত্রী-দেবতাকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিতে বিশেষ দেখা যায় না। ঋগ্বেদে দ্যাবা-পৃথিবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বর লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায় না। স্ত্রী-দেবতার পূজা আর্য্য-অনার্য্য-সংমিশ্রণের পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা।

ভূমাতার উপাসনা যে সিন্ধু-সভ্যতায় প্রচলিত ছিল ইহা হরপ্পার একটী লম্বা শীলমোহরের ছাপে [১] দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অঙ্কিত আছে, একটী স্ত্রীমূর্ত্তির উদর হইতে একটী বৃক্ষের জন্ম হইয়াছে।

পুং-দেবতা —

মাতৃকা-পূজার সঙ্গে সঙ্গে আদিম শিবের পূজাও প্রচলিত ছিল বলিয়া মোহেন্-জো-দড়োর এক শীলমোহর দেখিয়া অনুমান করা যায়। [২] ইহাতে যোগাসনে উপবিষ্ট এক ত্রিবক্ত্র দেব-মূর্ত্তির চতুষ্পার্শে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ এবং অধোদেশে মৃগ ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয়, শিবকে এখানে শুধু মহাযোগিবেশে নয়, পশুপতিভাবেও কল্পনা করা হইয়াছে। যোগ আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক যুগে আর্য্য-সভ্যতায় ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এইরূপ যোগমগ্ন অপর এক প্রস্তর-মূর্ত্তি [৩] মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া গিয়াছে এবং

[১] M. I. C., Vol. I, Pl. XII 12.
[২] M. I. C., Vol. I, Pl. XIII, 17.
[৩] M. I. C., Pl. XCVIII.

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সর্ব্বপ্রথমে এই মূর্ত্তির যোগাবিষ্ট ভাবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইরূপ যোগাবিষ্ট ভাবের মূর্ত্তি আরও পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩০-৩১ সালেও মোহেন্‌-জো-দড়োতে প্রাপ্ত এক শীলমোহরের মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট এক মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

শাক্ত-ধর্ম্ম —

শাক্ত-ধর্ম্ম মাতৃকা-পূজার (cult of Mother Goddess) অঙ্গীভূত। শাক্ত-ধর্ম্মের কোন পৃথক্ অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ মোহেন্‌-জো-দড়ো কিংবা হরপ্পাতে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্ম্মসমূহের অন্যতম। শক্তিপূজা শৈব ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবাপন্ন। শাক্তমতে একের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ের বিকাশ (বিভূতি) কল্পিত হইয়া থাকে। এশিয়া-মাইনর ও ভূমধ্য-সাগরের তীরে এইরূপ শক্তিপূজার অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইজিপ্ত, ফিনিসিয়া (Phœnicia) গ্রীস প্রভৃতি দেশে শাক্ত-ধর্ম্মের অনুরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশ্ন (লিঙ্গ)-পূজা —

লিঙ্গ-পূজা যে সিন্ধুপত্যকায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হরপ্পা ও মোহেন্‌-জো-দড়োতে নানারূপ প্রস্তর, মৃত্তিকা ও ফায়েন্স (faience) প্রভৃতি নির্ম্মিত অসংখ্য লিঙ্গ ও বলয়াকৃতি দ্রব্য লিঙ্গ-পূজার নিদর্শন বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইহা অনার্য্য, এবং প্রাগ্-আর্য্যসভ্যতার নিজস্ব মৌলিক বস্তু বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন। ঋগ্বেদে শিশ্নদেব-দের প্রতি যথেষ্ট ভর্ৎসনা-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ইহা অবৈদিক ধর্ম্ম। বলয়াকৃতি গৌরী-পট্টের মত দ্রব্য ও লিঙ্গ-চিহ্ন স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্ (Sir Aurel Stein) বেলুচিস্থানের তাম্রপ্রস্তর-যুগের নগরাভ্যন্তর হইতেও আবিষ্কার করিয়াছেন।

অতি ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৩ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ লিঙ্গাকার প্রস্তর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটগুলি দেখিতে আধুনিক দাবা খেলার ব'ড়ের (গুটির) মত।

প্রস্তরাঙ্গুরীয়ক—

এখানে অর্দ্ধ ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চারি ফুট ব্যাসের অঙ্গুরীয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় দ্রব্যে দৈব শক্তি আছে বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসীর ভয় ও বিশ্বাস। তক্ষশীলার প্রস্তরাঙ্গুরীয়তে ভূমির উর্ব্বরতাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অধিষ্ঠান আরোপ করা হইয়া থাকে। মোহেন্-জো-দড়োর এসকল দ্রব্য যোনিপূজার নিদর্শনও মনে করা যাইতে পারে।

বৃক্ষোপাসনা—

কয়েকটী শীলমোহরে ক্ষোদিত ছবি হইতে সিন্ধু-সভ্যতায় বৃক্ষের পূজাও প্রচলিত ছিল বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন।

জীবজন্তুর পূজা—

বৃক্ষোপাসনা অপেক্ষা মোহেন্-জো-দাড়োতে জীবজন্তুর পূজা অধিকতর প্রসার-লাভ করিয়াছিল বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল অনুমান করেন। শীলমোহরে ক্ষোদিত চিত্রে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ ও ঘড়িয়াল-কুমীর প্রভৃতি জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সকলগুলিরই পোড়া মাটীর তৈরী প্রতিমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর এবং ফায়েন্স (faience) নির্ম্মিত জীবজন্তুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত জীবজন্তুতে দেবত্ব আরোপ করা হইত বলিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ মনে করেন।

কোন এক অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবৃষ মূর্ত্তিকে একশৃঙ্গী ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করিতে শীলমোহরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সুমের দেশীয় গিলগ্যামেশ (Gilgamesh) নামক বীরের সাহায্যকারী অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবৃষ আকৃতি-বিশিষ্ট ইয়বনি (Eabani) মূর্ত্তির অনুরূপ। সিন্ধুপত্যকার নর-বৃষ-মূর্ত্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্যকশিপু-নিধনকারী নৃসিংহমূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পৌরাণিক ভারতীয়েরা নৃসিংহকে যেমন ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া পূজা করিতেন সেইরূপ সিন্ধুপত্যকাবাসীরাও নর-বৃষ-মূর্ত্তিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিতেন বলিয়া মনে হয়।

নাগপূজা—

মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের মধ্যে নাগ (সর্প) -পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন। ইঁহারা হয়ত জল-দেবতার পূজাও করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৃতদেহের সংকার

সিন্ধুসভ্যতার মৃতদেহ-সংকার সম্বন্ধে এখনও একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। মোহেন্-জো-দড়োতে এখনও এই বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে সিন্ধুসভ্যতায় মৃতদেহ-সংকারের তিন প্রকার প্রণালী বিদ্যমান ছিল বলিয়া আপাততঃ অনুমান করা হইয়াছে :

(১) পূর্ণ সমাধি (Complete burial)

(২) আংশিক সমাধি (Fractional burial)

(৩) দাহান্তর সমাধি (Post-cremation burial)

প্রথম প্রণালীর সংকারের প্রমাণ মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা এবং বেলুচিস্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রথানুসারে মৃত দেহকে অবিচ্ছিন্নরূপে সোজা- অথবা উপবিষ্টভাবে এক পার্শ্বে প্রোথিত করা হইত। হরপ্পার সমাধি-ক্ষেত্রের দ্বিতীয় স্তরেও এইরূপ পূর্ণ সমাধির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। হরপ্পাতে এই সমাধির সঙ্গে মাটীর কলসী, থালা, মালসা, গেলাস, উপহার-পাত্র প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রণালীর অর্থাৎ আংশিক সমাধি মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা এবং বেলুচিস্থানের অন্তর্গত নাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রথানুসারে মাটীর বড় বড় হাঁড়িতে মৃতের

মস্তক এবং কতকগুলি অস্থি রক্ষা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত। হরপ্পার সমাধি-ক্ষেত্র হইতে এইরূপ অস্থিপূর্ণ বহু মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মৃৎপাত্রের আকার ও আয়তন সাধারণ পাত্র হইতে বিভিন্ন। এইগুলির বহির্দ্দেশে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত হইত। সাধারণতঃ ময়ূর, গো, বন্য ছাগ কিংবা হরিণের চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ ও লতা-পাতার ছবিও অঙ্কন করা হইত। মৃৎপাত্র-চিত্রের জন্য হরপ্পাই বিখ্যাত। অনেকে অনুমান করেন প্রথমে মৃত-দেহ উম্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হইত এবং পশুপক্ষীতে মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে কয়েক দিন পর মৃতের মস্তক ও কয়েক খণ্ড অস্থি পাত্র-মধ্যে রাখিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত।[১]

তৃতীয় প্রথানুসারে মৃত দেহটা দাহ করা হইত, এবং দাহা-বশিষ্ট কয়েক খণ্ড অস্থি ও ভস্ম কোন মৃৎপাত্রে রক্ষিত হইত। এই মৃৎপাত্র সাধারণতঃ ভূগর্ভে নিহিত করা হইত। হরপ্পার কোন ইষ্টক-বেদীতে ক্ষোদিত গর্ত্তে রক্ষিত এক মৃৎপাত্রে ভস্ম ও মৃত্তিকাদি পাওয়া গিয়াছে। সেখানে আবার চতুষ্কোণ এক মঞ্চের মধ্যে দুইটি গর্ত্তে ভস্ম ও দগ্ধ অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রাচীন সমাধি-শেষ বলিয়া অনুমিত হয়।[২]

মোহেন্-জো-দড়োতে হরপ্পার মত সমাধিস্থান হিসাবে স্বতন্ত্র কোন স্থান এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বিচ্ছিন্নভাবে স্থানে স্থানে নর-কঙ্কাল ও নর-কপাল প্রভৃতি আবিষ্কৃত

[১] হরপ্পাতে মানুষের মস্তক ও অস্থিপূর্ণ শতাধিক মৃদ্ভাণ্ড ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

[২] Arch. Sur. Rep., 1924-25, pp 74f; also pls. XXIV (a), (b); XXV (c), (d).

হইয়াছে। মোহেন-জো-দড়োর সমাধিস্থান এখনও লোক-চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা আবিষ্কৃত হইলেই এখানকার সমাধি-প্রশ্নের আরও অনেক তথ্য নির্ণীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে এখন পর্য্যন্ত যে সব উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, এই সব পরীক্ষা করিয়া স্যর্ জন্ মার্শাল্ অনুমান করেন, সিন্ধু-সভ্যতার যুগে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রধানতঃ শব-দাহ এবং দাহান্তর দগ্ধ অস্থির সমাধি অনুষ্ঠিত হইত। পূর্ণ সমাধি ও আংশিক সমাধি সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতে আগত বিদেশীয়দের প্রভাবে সিন্ধুপত্যকায় ক্রমশঃ স্থান লাভ করিয়াছিল বলিয়া তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।[১]

---

[১] M. I. C., Vol. I. p. 90.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধাতু

মানব-সভ্যতার আত্মস্ফুরণে ধাতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। যব এবং গমের ব্যবহার, পশু-পালন, হস্ত-দ্বারা ও কুলাল-চক্রে মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ এবং তামা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার ও ব্যবহার প্রভৃতিতে সভ্যতার ধারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্তের মধ্যে তামার আবিষ্কারই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। ইলিয়ট স্মিথ-(Elliot Smith) প্রমুখ পণ্ডিতেরা ইজিপ্ত্‌কে তাঁমা-আবিষ্কারের কেন্দ্র ও জগতের সভ্যতা-বিস্তারের অগ্রদূত বলিয়া মনে করেন। গর্ডন্ চাইল্ড্-(Gordon Childe) এর মতে সুমের দেশ (Sumer) তামা-আবিষ্কারের প্রথম স্থান। সুসা (Susa) এবং আনাউ (Anau) নামক স্থানেও উল্লিখিত ধাতব পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সিন্ধুতীরবর্ত্তী মোহেন্-জো-দড়োতেও তাম্র ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত দেশ খ্রীষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। উল্লিখিত সমস্ত স্থানেই সভ্যতার একটা সাধারণ প্রগতি এবং সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। পশুপালন, কৃষিকর্ম্ম, সূতাকাটা, চক্রে-মৃন্ময়-পাত্র-নির্ম্মাণ এবং তাহাতে চিত্রকলার প্রবর্ত্তন, তামার আবিষ্কার ও বহুল প্রচার, এবং লৌহ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা প্রভৃতি

এই সকল স্থানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক স্থানে আবার পৃথক্ পৃথক ভাবে আত্মস্ফুরণের একটা স্বাতন্ত্র্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রযুগের সভ্যতার মূল কেন্দ্র যে কোথায় ছিল তাহা বলা খুব কঠিন। বৈদিক আর্য্যদের "অয়স্"-এর সঙ্গে এই সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযুগের কোন সম্পর্ক আছে কি-না ভাবিবার বিষয়। তাম্রযুগের চওড়া কুঠার (flat celt) ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-ইউরোপ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেরই প্রাচীন কেন্দ্রগুলিতে আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যেই বা কি সম্বন্ধ আছে? এই সব বিষয়ে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত ধাতব পদার্থের বিষয় বর্তমানে আলোচনা-প্রসঙ্গে কিছু কিছু তুলনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বর্ণ

চাকচক্য এবং সৌন্দর্য্যের জন্য ধাতুর মধ্যে স্বর্ণই বোধ হয় মানুষের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাম্র-যুগে ধাতু দ্রবীকরণ-প্রণালী আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইহাকে কাজে লাগাইবার সুযোগ খুব কমই ঘটিয়াছিল। এই প্রণালী-আবিষ্কারের পর হইতে সোনার গহনাপত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যেরা সোনাকে "হিরণ্য" বলিতেন। ইঁহারা সোনার ভূয়সী প্রশংসাও করিয়া গিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পা নগরেও সোনার বিবিধ অলঙ্কার আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাকালে নদী-সৈকত হইতে সোনা সংগৃহীত হইত। ঋগ্বেদে সিন্ধুনদীকে

"হিরণ্যয়ী",[১] "হিরণ্যবর্তনি"[২] প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয়েরা ভূগর্ভ হইতেও খনিজ স্বর্ণ-সংগ্রহ করিতে জানিতেন বলিয়াও বেদে[৩] প্রমাণ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতার[৪] ও শতপথব্রাহ্মণের[৫] ঋষিরা স্বর্ণ-প্রক্ষালন-প্রণালী অবগত ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

মোহেন্-জো-দড়োর স্বর্ণাভরণ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাগৈতিহাসিক ভারতে ব্যবহৃত স্বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর স্বর্ণে বিশুদ্ধ স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে ইলেকট্রোন্ (electron) বলা হয়। এইরূপ মিশ্রিত স্বর্ণ মহীশূরের কোলার (Kolär) এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুরের স্বর্ণখনিতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্যর্ জন্ মার্শাল্-প্রমুখ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, দক্ষিণাপথের উল্লিখিত স্থানসমূহ হইতে সম্ভবতঃ সিন্ধুপত্যকায় স্বর্ণ আমদানী করা হইত।[৬] মোহেন্-জো-দড়োতে যে স্বর্ণকারের শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল ইহা গহনাপত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলেই বুঝা যায়। হরপ্পার স্বর্ণকারেরা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে রৌপ্য-পাত্রে রক্ষিত সোনার কণ্ঠহার (necklace), হাতের বলয়,

[১] R. V., X. 75. 8.
[২] R. V., VIII. 26. 18.
[৩] R. V., I. 117. 5. ; A. V. XII. 1. 6.
[৪] Tait. Sam., VI. 1. 7. 1.
[৫] Sat. Br., II. 1. 1. 5.
[৬] M.I.C., Vol. I. p. 30.

কানের দুল, মাথার বন্ধনী[১] (fillet) ও চূড়া, সূচ এবং মালা প্রভৃতি নানাবিধ স্বর্ণদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেদেও এইরূপ নানাবিধ সোনার গহনাপত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গলার নিষ্ক[২] (ঋগ্বেদ 1. 26. 2 মতে নিষ্ক, মুদ্রা হিসাবে বোধ হয় ব্যবহৃত হইত।) ও কর্ণশোভনা,[৩] প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বৈদিকযুগে স্থলবিশেষে স্বর্ণপাত্রেরও[৪] প্রচলন ছিল। বৈদিকযুগের অষ্টাপ্রুত্, শতমান,[৫] কৃষ্ণল[৬] প্রভৃতিতে পণ্ডিতেরা ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার আদিম অবস্থা বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর পুরাবস্তুর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার কোন চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

রৌপ্য

মোহেন্-জো-দড়োতে সোনার চেয়ে রূপা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশর ও সুমের দেশ অপেক্ষাও এখানে রূপার জিনিষ বেশী। মোহেন্-জো-দড়োর এই রূপা কোন্ স্থান হইতে আমদানী করা হইত সেই বিষয়ে কোন তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতা,[৭] কাঠক সংহিতা[৮] ও শতপথ ব্রাহ্মণ[৯] প্রভৃতিতে রজতের

১ এইরূপ মস্তক-বন্ধনী (fillet) সুমেরবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

২ R. V., II. 33. 10.; VIII. 47. 15., etc.

৩ R. V., VIII. 78. 3.

৪ Tait. Sam., III. 4. 1. 4; Kāṭhaka Sam., XIII. 10.

৫ Sat. Br., V. 5. 4. 16. XII. 7. 2. 13.

৬ Tait. Sam., II. 3. 2. 1. Kāṭhaka Sam., XI. 4., etc.

৭ তৈঃ সঃ ১।৫।১।২

৮ কাঠক সঃ ১০।৪

৯ শতঃ ব্রাঃ ১২।৪।৪।৭ ; ১৩।৪।২।১০

(রৌপ্যের) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োতে মূল্যবান্ অলঙ্কার-পত্র রাখার জন্য রৌপ্যপাত্র ব্যবহৃত হইত। নানারূপ মূল্যবান্ গহনাপত্রপূর্ণ এক রৌপ্য পাত্র ঐস্থানে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ পাত্রের ভিতরে সোনা ও রূপার নানারূপ গহনা, বলয়, আংটি বিভিন্নপ্রকার মালা, ও কয়েকটী ছোট পাত্র পাওয়া গিয়াছে। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা ভিন্ন গাঙ্গেরিয়াতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের রৌপ্যদ্রব্যের নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন বৈদিকসাহিত্যেও[১] রৌপ্য-নির্ম্মিত রুক্ম, পাত্র, ও নিষ্কের (মুদ্রা) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টধর্ম্ম মতেও উল্লেখ আছে, অ্যাব্রাহাম (Abraham) এফ্রোনের (Ephron) নিকট হইতে রৌপ্য দিয়া কবরের স্থান ক্রয় করিয়াছিলেন।[২]

গাওল্যাণ্ড সাহেব (Gowland) বলেন, প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দের ক্যালডিন-লেখে (Chaldaean Inscription) রৌপ্য, দ্রব্যের মূল্য হিসাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।[৩]

তামা ও ব্রোঞ্জ্

প্রস্তরযুগের পরের যুগকে পণ্ডিতেরা 'ব্রোঞ্জ্-যুগ' বলিয়া থাকেন। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে এই নামটী সকল

১ শতপথ ব্রাঃ ১২।৮।৩।১১; তৈঃ ব্রাঃ ২।২।৯।২; ৩।৯।৬।৩
পঞ্চবিংশ ব্রাঃ ১৭।১।১৪

২ Encyclopaedia Br., 14th ed.

৩ *Ibid.*

দেশে সমানভাবে প্রযোজ্য হয় না। কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং ইহার সমসাময়িক মিশর ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি কোন কোন স্থানে প্রথমে তাম্র প্রচলিত হয়, ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে টিন ও তাম্রের সম্মিলিত ধাতু ব্রোঞ্জের আবিষ্কার হয়। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন প্রধান দেশে প্রথম হইতেই প্রাকৃতিক অবস্থাতেই টিন ও তাম্রের সংমিশ্রিত ধাতু ব্রোঞ্জ্ পাওয়া যায় এবং সে সব স্থানে তাম্রযুগের পত্তনই হয় নাই; সে জন্যই তাহারা প্রস্তরযুগের পরবর্ত্তী যুগকে ব্রোঞ্জ্-যুগ বলিয়া থাকেন। আমাদের দেশে কোন কালে ব্রোঞ্জ্ যুগ ছিল না বলিয়া ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ (V. A. Smith) মনে করেন।[১] তিনি শুধু উত্তর-ভারতের কতিপয় স্থান এবং গাঙ্গেরিয়ার আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি যখন এই বিষয়ে গবেষণা করেন তখন মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার বিষয় লোকে জানিত না; এবং সেই সব স্থানে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের তাম্র- বা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত কোন দ্রব্য যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে এই বিষয় কাহারও ধারণা হয় নাই। সেজন্য তৎকালে স্মিথ্ সাহেবের অনুমানই সকলের কাছে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কিন্তু এখন হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কারের ফলে সেই সব স্থানে ভূরি ভূরি ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত দ্রব্য ভূগর্ভ হইতে বাহির হইতেছে। এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে বিশুদ্ধ তাম্র- ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত দ্রব্য একই সঙ্গে পাশাপাশি পাওয়া যাইতেছে।

১ I. A., 1905, pp. 229 f.

সে সময়ের কারিকরেরা যেমন এক দিকে খাঁটী তামার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত পক্ষান্তরে ব্রোঞ্জ্ তৈয়ারের কৌশল এবং তাহাদ্বারা নানারূপ দৈনন্দিন কার্য্যের জিনিষপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রসাধন-সামগ্রীও নির্ম্মাণ করিতে জানিত।

মোহেন-জো-দড়োর তাম্র- ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত দ্রব্যকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, (২) নানাবিধ হাতিয়ার এবং (৩) অন্যান্য গৃহসামগ্রী।

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক স্থানসমূহ হইতে যে সব দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষ তৎকালে অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। আক্রমণ-শস্ত্রের মধ্যে বর্শা, ছোরা, তীর ও ধনুক প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানে যে জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়, বৈদিক আর্য্যদেরও প্রায় তৎসমুদয় ছিল। ঋগ্বেদে নানাজাতীয় আয়ুধের মধ্যে কুঠার (পরশু বা তেজঃ), বর্শা (ঋষ্টি, রম্ভিণী, শরু) এবং তরবারি (অসি বা কৃতি) প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনুক (ধনুস, ধন্বন্) এবং বাণও যুদ্ধ-উপলক্ষে ব্যবহৃত হইত। তাঁহারা দুই প্রকারের বাণ ব্যবহার করিতেন। এক প্রকার বাণ বিষাক্ত, এবং ইহার অগ্রভাগ শৃঙ্গ-(রুরুশীর্ষ্ণ) নির্ম্মিত থাকিত। অন্য প্রকার বাণের অগ্রভাগ তাম্র- বা ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত (অয়োমুখম্) হইত। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ তাম্র- বা ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত বাণের অগ্রভাগ মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যুদ্ধের সরঞ্জাম যে বহুদিন পর্য্যন্ত অনেকটা একই প্রকার ছিল তাহা খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লেখ হইতেও

বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন অসি, তোমর, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি গতানুগতিক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে।

কুঠার—

মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত কুঠারকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১) সরু-লম্বা এবং (২) খাটো-চওড়া। প্রথম শ্রেণীর কুঠারকে পণ্ডিতেরা 'চেপ্টা কুঠার' (flat celt) আখ্যা দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কুঠার ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সুসা, মেসোপটেমিয়া, ক্রীত্, মিশর ও ইউরোপের অনেক দেশে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। মোহেন্-জো-দড়োতে কুঠার-নির্ম্মাণের জন্য ব্রোঞ্জ্ অপেক্ষা তামারই প্রচলন বেশী ছিল। ট্রয়্ এবং ইজিয়ন্ (Aegean) দ্বীপে দ্রব্য-নির্ম্মাণে তামার পরিবর্ত্তে ব্রোঞ্জ্ প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া গর্ডন চাইল্ড অনুমান করেন।[১] মিশরের প্রাচীন নাকদা সহরে প্রাপ্ত কুঠারের সঙ্গেও মোহেন্-জো-দড়োর কুঠারের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।[২] (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ খাটো ও চওড়া কুঠার মোহেন্-জো-দড়োতে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি বিজনোর-জেলায় প্রাপ্ত, লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত, তামার কুঠারের মত। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় গাঙ্গেরিয়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি কুঠারের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োর কোন কোন কুঠারের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

১ Gordon Childe, Bronze Age, p. 61.

২ De Morgan, La Prehistoire Orientale, Vol. II, fig. 267.

বর্শা—

মোহেন্‌-জো-দড়োর বর্শা সমসাময়িক মিশর বা মেসোপটেমিয়ার বর্শার মত নয়। এইগুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা ও চেপ্‌টা। এইগুলিতে কোন গর্ত্ত কিংবা মধ্যভাগে কোন শিরা নাই, অধিকন্তু একটা লেজ (tang) আছে। এইরূপ বর্শা এখনও আফ্রিকার কোন কোন জাতি ব্যবহার করে। এইরূপ অনুন্নত প্রণালীর বর্শা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা সভ্য সিন্ধুতীরবাসীদের নিজস্ব জিনিষ নয়। ইহা হয়ত কোন বিজিত অসভ্য জাতি হইতে প্রাপ্ত লুণ্ঠন-দ্রব্য। সমসাময়িক এলাম, সুমের প্রভৃতি স্থানে তৎকালে মধ্যভাগে শিরাযুক্ত এবং গর্ত্তবিশিষ্ট বর্শা ব্যবহৃত হইত। মোহেন্‌-জো-দড়োর প্রায় সমস্ত বর্শাই তাম্র-নির্ম্মিত ও ইহাদের কয়েকটী বর্শা পত্রাকৃতি।

ছোরা—

বহু প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশেষ বিশেষ সময়, আমরা আন্তর্জ্জাতিক সমান কিংবা বিভিন্ন আকারের দ্রব্যাদি পরীক্ষা-দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। এইরূপ বৈশিষ্ট্যমূলক সময়-নির্দ্ধারণের জন্য কুঠার প্রভৃতি অপেক্ষা ছোরার মূল্য অনেক বেশী। ধাতু-যুগের পত্তন হইতেই সমগ্র জগতে ছোরার প্রচলন আরম্ভ হইতে দেখা যায়। আদিম যুগের ছোরা দেখিতে ত্রিকোণাকার এবং উভয় পার্শ্ব মোটামুটি চেপ্‌টা। ঐগুলি খুব ছোট এবং লম্বায় ৬ ইঞ্চির বেশী নয়।[১] অন্য লোকের শরীরে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই

[১] Childe, Bronze Age, p. 75.

ছোরা তৈরী করা হইত। পুরাকালে কাঠ, হাড়, হাতীর দাঁত কিংবা ধাতু দিয়া ছোরার হাতল নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন ছোরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) এক প্রকার ছোরার গোড়ার দিকে লম্বা লেজ থাকিত এবং (২) দ্বিতীয় প্রকারের কোন লেজ থাকিত না।

মোহেন্-জো-দড়োতে শুধু লেজবিশিষ্ট [১] ছোরাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পেরেক দিয়া হাতল আটকাইয়া দেওয়ার মত কোন ছিদ্র নাই। এই গুলির জন্য বাঁশের কিংবা কাঠের হাতলই ব্যবহৃত হইত। মিশরের সর্ব্বপ্রাচীন ছোরার অগ্রভাগ ত্রিকোণাকার, এবং গোড়ার দিক্‌ও ত্রিকোণাকার, সুতরাং সমগ্র ছোরাটা দেখিতে একটা চর্তুভুজের মত। মেসোপটেমিয়ার সর্ব্বপ্রাচীন ছোরা লেজবিশিষ্ট এবং হাতলের সঙ্গে লাগাইবার জন্য লেজে পেরেক বসাইবার ছিদ্র (rivet-hole) আছে। [২]

বাণ-মুখ (Arrow-head)—

মানবজাতির আদিম সভ্যতার সময়ে অর্থাৎ নব-প্রস্তর-যুগে (Neolithic age) এবং তাম্র-প্রস্তর-যুগেরও প্রথম ভাগে বাণ-মুখ-নির্ম্মাণের জন্য চক্‌মকি পাথর এবং হাড় ব্যবহৃত হইত। ব্রোঞ্জ্‌যুগের প্রথম অবস্থায় মিশর দেশে এই উভয় দ্রব্য-দ্বারা বাণমুখ তৈরী হইত। [৩] তামা ও ব্রোঞ্জের বিস্তার-লাভের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি (তামা ও ব্রোঞ্জ্) বাণের

[১] M. I. C., Vol III. Pl. CXXXV. 3, 5, 6.

[২] Childe, Bronze Age, Fig 7, No. 4, p. 77.

[৩] *Ibid*, pp. 92-4

অগ্রভাগের জন্যও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপ হইতে এখনও চক্‌মকি পাথরের কোন বাণ-মুখ আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্য কোন কোন স্থান হইতে পাথরের বাণ-মুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা হইতে তাম্রনির্ম্মিত দ্বিধাবিভক্ত বাণমুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি ঠিক পাথরের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিশর, উত্তর-পারস্য এবং পশ্চিম-ইউরোপে নব-প্রস্তর-যুগ ও তাম্র-প্রস্তর-যুগে চক্‌মকি পাথরের যে সব, নমুনা পাওয়া যায়, এইখানে প্রাপ্ত বাণ-মুখে এইগুলিরই একটু সংশোধিত অনুকরণ দেখা যায়। এই আকৃতির ধাতুজ বাণ-মুখ প্রাচীন গ্রীস্ এবং ককেসাস্ (Caucasus) প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল। মধ্য ও অন্ত্য ব্রোঞ্জ্-যুগে ধাতুনির্ম্মিত দ্বিধাবিভক্ত নানারূপ লম্বালেজবিশিষ্ট বাণ-মুখ মিশর, গ্রীস্ ও মধ্য-ইউরোপে ব্যবহৃত হইত।[১]

এখানে ধাতুজ (তামা- ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত) অন্যান্য হাতিয়ার ও গৃহসামগ্রীর মধ্যে বাটালি, ক্ষুর, করাত, বড়শি, কাস্তে, বেধনী (awl), শলাকা ও সূচ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাটালি—

ধাতুজ বাটালির আবিষ্কার খুব কৌতূহলজনক। আদিম প্রস্তর-কুঠারের অনুকরণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাদের পার্থক্য এই যে কুঠারগুলি চেপ্‌টা এবং বাটালি-গুলি অপেক্ষাকৃত সরু। সিন্ধুপত্যকাতে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর বাটালি দেখিতে পাওয়া যায়।

[১] Childe, Bronze Age, p. 94.

(ক) চৌফলা-যুক্ত ও লেজহীন; মুখের দিক্ চেপ্টা ও ধারাল।[১]

(খ) চৌফলা-যুক্ত কিন্তু গোড়ার দিকে হাতল লাগাইবার জন্য লেজযুক্ত।[২]

(গ) গোল ও লম্বা।[৩]

প্রথম দুই জাতীয় বাটালি বহুসংখ্যক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর বাটালির সংখ্যা খুব কম। প্রথম শ্রেণীর বাটালি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পুরাতন দ্রব্যের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বাটালি মোহেন্-জো-দড়োর বিশেষ সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। এরূপ জিনিষ আর কোথাও এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। তৃতীয় শ্রেণীর বাটালির একদিক্ খুব সূক্ষ্মাগ্র। এইগুলি সম্ভবতঃ পাথরের কাজে ব্যবহৃত হইত। এইগুলির সাহায্যে বোধ হয় পাথর-ভাঙ্গা ও খোদাই প্রভৃতি কাজ করা হইত।

ক্ষুর—

আদিম যুগের মানুষ পাতলা ও ধারাল চক্‌মকি পাথর দিয়াই ক্ষুরের কাজ চালাইত। মিশর প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কালে যে সমস্ত ধাতুজ ক্ষুর ব্যবহৃত হইত ঐগুলি দেখিতে চক্‌মকি পাথরের ক্ষুরের মতই।[৪] হরপ্পা ও মোহেন্-জো-

১ M. I. C., Vol. III. Pl. CXXXV. 11, 14.
২ *Ibid*, Pl. CXXXV. 12, 13, 15.
৩ *Ibid*, Pl. CXLII. 15.
৪ Childe, Bronze Age, p. 97.

দড়োতে চক্‌মকি পাথরের নমুনার কোন ক্ষুর আবিষ্কৃত হয় নাই। এমন কি ধাতু- (ব্রোঞ্জ্) নির্ম্মিত ক্ষুরের সংখ্যাও এই উভয় স্থানেই খুব অল্প, এবং ইহাদের আকৃতিরও বিশেষত্ব আছে।

বৈদিক সাহিত্যে ক্ষুর এবং ক্ষুরের উপযোগিতার বিষয় বহুল উল্লেখ আছে।[১]

করাত—

ভাল এবং ভগ্ন অবস্থায় কয়েকখানা করাত মোহেন্-জো-দড়োতে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত। ভাল করাতগুলি দেখিতে ঠিক আধুনিক যুগের লৌহ-নির্ম্মিত করাতের মতই। মোহেন্-জো-দড়োর করাতের গোড়ার দিকে পেরেক দিয়া হাতলে আটকাইবার জন্য দুইটি করিয়া ছিদ্র আছে। এই ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত করাত বোধ হয় প্রাচীন-কালে শঙ্খ কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান যুগে শাঁখারীরা লোহার করাত দিয়া শঙ্খ কাটিয়া থাকে।

বড়শি —

ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত ছোট এবং বড় নানারূপ বড়শি মোহেন্-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের কয়েকটী খুব সুন্দর ও অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটী ভাঙ্গিয়া অথবা

[১] R. V. I. 166. 10; X. 142. 4.
A. V. VI. 68. 1. 3., VIII. 2.7. 17., Sat. Br. II. 6. 4. 5., III, 1. 2. 7. Tait. Sam. II. 1. 5. 7., 5. 5. 6., IV. 3. 12. 3., V. 6. 6. 1., Mait. Sam. I. 10. 14. etc. Kāṭh. Sam. VI. 3. 12. 3., Nir. V. 5., Vāj. Sam. XV. 4.

এবং ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। এই আকৃতির তাম্র-নির্ম্মিত বড়শি মিশর দেশের নাকদা (Naqada) নামক স্থানেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের বিশেষত্ব এই যে মুখের দিকে কোন হুল বা ফলা (barb) নাই এবং উপর দিকে সুতা লাগাইবার জন্য চক্ষুর মত একটী করিয়া গর্ত্ত আছে।[১]

কাস্তে—

এখানে কাস্তের ভাঙ্গা টুকরা পাওয়া গিয়াছে। ইহা দেখিতে কতকটা গোলাকার এবং ইহার ভিতরের দিক্ অপেক্ষা বাহিরের দিক্ পাতলা ও ধারাল। এই দিক্ই বোধ হয়, কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। মেসোপটেমিয়ার 'কিশ' নামক স্থানে এইরূপ কাস্তের কতকগুলি ভগ্নখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাঃ ম্যাকে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[২]

বৈদিক সাহিত্যে[৩] "দাত্র" শব্দের উল্লেখ আছে। ইহাকে কোন কোন পণ্ডিত কাস্তে (sickle) বলিয়া মনে করেন।

বেধনী (Awl)—

সিন্ধুপত্যকার বেধনীর কোন কোনটী দুই দিকেই, আবার কোন কোনটী একদিকে সূক্ষ্ম; এইগুলি তিন চারি ইঞ্চি লম্বা। মিসর দেশের নাকদা (Naqada) নামক স্থানের বেধনী দেখিতে এখানকার মতই।[৪]

[১] De Morgan, Prehistoire Orientale, Vol. II, p. 214, Fig. 267.

[২] Vol. I, p. 501.

[৩] R. V. VIII. 78. 10.; Nirukta, II, 1; Mait. Sam. IV. 2. 9. এখানে বলা হইয়াছে গরুর কানে কাস্তের মত চিহ্ন দেওয়া হইত (দাত্রকর্ণঃ)। 'দাত্র' হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত 'দা' অথবা 'দাও' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

[৪] De Morgan, *op. cit.*, Vol. II, p. 214, Fig. 267.

ম্যাকডোনেল্ (Macdonell) ও কিথ্ (Keith) ঋগ্বেদে উল্লিখিত[১] পূষদেবের 'আরা' নামক অস্ত্রকেই পরবর্ত্তীকালের চামড়া ছিদ্রকরার বেধনী বলিয়া অনুমান করেন। ঋগ্বেদের[২] কোন কোন স্থানে বর্ণিত আছে মরুত্ এবং ত্বষ্টা 'বাশী' নামক অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। অথর্ব্ব বেদের[৩] মতে এই শব্দে ছুতারের (carpenter) ছুরি বুঝায়। সায়ণাচার্য্যের মতে এই শব্দের অর্থ বেধনীও হইতে পারে।

সূচ (Needle)—

এখানে তামা এবং ব্রোঞ্জের কতকগুলি তারের মত জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির এক দিকে চোখের মত একটী করিয়া গর্ত্ত আছে। এইজন্য এইগুলি সূচ বলিয়া মনে হয়। মিসরের নাকদা (Naqada) নামক স্থানেও এই নমুনার সূচ আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৪]

ঋগ্বেদের যুগে সূচকে 'বেশী' বলা হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।[৫]

শলাকা (Rod)—

তামা ও ব্রোঞ্জের লম্বা শলাকা এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের উভয় দিক্ গোল। কাজেই কোন জিনিস ছিদ্র করার উদ্দেশ্যে ইহারা ব্যবহৃত হইত না। এইগুলির ব্যবহার

[১] RV. VI. 53. 8.

[২] R. V. I. 37. 2.; 88. 3.; V. 53. 4.; VIII. 29. 3.

[৩] A. V. X. 6. 3.

[৪] De Morgan, *op. cit.*, Vol. II, p. 214, Fig. 267.

[৫] RV. VIII. 18. 17. *Cf.* Hopkins, Journal of the American Oriental Society, 15, p. 264 n.

বিষয়ে কেহ কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন, এইগুলি অঞ্জন-শলাকারূপে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক মিসরে অঞ্জন-প্রয়োগের জন্য এইরূপ শলাকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রাচীন মিসরেও এই কার্য্যের জন্য শলাকা ব্যবহৃত হইত বলিয়া তিনি অনুমান করেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও এইরূপ অঞ্জন-শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফাঁড়ি (Spacer)—

তামা ও ব্রোঞ্জের বহু ফাঁড়ি [১] মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালা কিংবা মেখলার লহর প্রবেশ করাইবার জন্য ঐগুলিতে দুইটী হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত ছিদ্র থাকিত। তামা কিংবা ব্রোঞ্জের সাদাসিধে লম্বা টুকরাতে ছিদ্র করিয়া সাধারণ ফাঁড়ি তৈরী হইত।

অন্যান্য গৃহ-সামগ্রী—

ধাতুজাত অন্যান্য গৃহসামগ্রীর মধ্যে বাসনকোসন, ছোটদের খেলনা, প্রসাধন দ্রব্য এবং গহনাপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাসন-কোসন—

নানা জাতীয় বাসনকোসনের মধ্যে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী কতকগুলি নমুনা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক।[২] এই ধাতুজ

[১] নরম পাথর, পোড়া মাটী, ফায়েন্স, সাদা মণ্ড, শঙ্খ এবং সোনা প্রভৃতিও ফাঁড়ি তৈরী করার জন্য ব্যবহৃত হইত।

[২] M. I. C. Vol. III, Pl. CXL, CXLI.

ভাণ্ডের ঠিক একই আকৃতিবিশিষ্ট মৃত্তিকানির্ম্মিত কতকগুলি ভাণ্ডও এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মাটী [১] ও ধাতুর [২] ভাণ্ডের উদরদেশে একই নমুনার শিরা বর্ত্তমান আছে। ঠিক একই আকৃতিবিশিষ্ট মৃন্ময় ও ধাতুজ কলসীও এখানে পাওয়া-গিয়াছে। তামা ও ব্রোঞ্জের থালা ও ঢাক্‌নিগুলি অতিশয় মনোরম। এইগুলি দেখিয়া মনে হয় মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা ধাতুদ্রব্য-নির্ম্মাণে কতই না পরিপক্ব হস্তের পরিচয় দিতে পারিত। পান-পাত্র, মালসা, হাঁড়ি ও কলসী প্রভৃতি দ্রব্যে মৃত্তিকা, তাম্র ও ব্রোঞ্জ্ প্রভৃতি উপাদানের বিভিন্নতায় সময় সময় আকৃতির বিশেষ কোন পার্থক্য হইত না।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে তৃতীয় যুগের (Late Period) একখানা ছোট ভারী থালা এবং ইহার ঢাক্‌নি দেখিতে খুব চমৎকার। [৩] এইরূপ আরও সুন্দর সুন্দর জিনিস দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন কড়া (pan) ও কলসী-ঢাক্‌নি প্রভৃতি শিল্পীর অত্যন্ত নিপুণ হস্তের পরিচায়ক।

---

১ M. I. C., Vol. III. Pl. LXXXVI. No. 22

২ *Ibid*, Pl. CXL. Nos. 7, 18

৩ *Ibid*, Pl. CXLII. No. I.

নবম পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্প ও মৃৎপাত্র-রঞ্জন

হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে নানা জাতীয় অসংখ্য মৃৎপাত্রের মধ্যে হাঁড়ি, মট্‌কী কলসী, শরা, গেলাস, গামলা, কড়া, পেয়ালা, ধুনুচি, থালা, বাটী, রেকাব, চুল্লী, জ্বালা, খাঁচা, দীপ, চামচ, ঘট, উপহার পাত্র (offering stand), পানপাত্র, ঢাক্‌নি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐগুলির মধ্যে আবার লম্বা, বেঁটে, নলাকৃতি, ঢেউ-তোলা, সরু-গলা ও সরু-তলার অনেক বিভিন্ন পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শির-ওয়ালা, খাঁজ-কাটা, হাতল-ওয়ালা নমুনাও আছে। স্থানে-স্থানে এমন এক-এক প্রস্থ সুন্দর ও মসৃণ পাত্র পাওয়া গিয়াছে যে এইগুলি দেখিলে এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্ফীত লোককেও অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। প্রস্তরের ব্যবহার আস্তে আস্তে সভ্য জগৎ হইতে বিরল হইতেছে অথচ তাম্র ও ব্রোঞ্জ্ পূর্ণমাত্রায় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের দ্রব্যসম্ভারের অভাব দূর করিতে অপ্রচুর, এইরূপ সময়ে মৃৎশিল্পের খুব উন্নতি জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সিন্ধুপত্যকায়ও এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সময়ে সেখানেও মৃৎশিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসীরা কোন কোন বিষয়ে আধুনিক যুগের মতই উন্নত প্রণালীর নাগরিক

জীবন যাপন করিত। সর্ব্বদা বসবাসের জন্য ইষ্টক-নির্ম্মিত মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিত। দ্বিতল, ত্রিতল গৃহের ছাদ হইতে জল নিকাশের জন্য আধুনিক যুগের মত মৃন্ময় নল (pipe) নির্ম্মাণ করিয়া খাড়াভাবে দেয়ালের সঙ্গে বসাইয়া দিত। স্থাপত্য ও পূর্ত্তকর্ম্মে ইহারা যে কোন হিসাবে পশ্চাৎপদ ছিল না, ইহা তাহাদের নানারূপ গাঁথনির দেয়াল, মঞ্চ, ড্রেন্ ও রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি দেখিলে নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয়।

এত বড় একটা সভ্যজাতির শিশুদের খেলা ও আমোদ-প্রমোদ চাই, কাজেই তাহাদের জন্য মাটী দিয়া নানারূপ খেলনা, যথা মানুষ, গরু, মহিষ, ভেড়া, বানর, শূকর, মুরগী, পাখী, মার্ব্বেল ও গাড়ী প্রভৃতি তৈরী হইল। গরীব লোকদের জন্য মাটীর বলয়, আংটী, মালা ও মেখলা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। জেলেদের জাল ডুবাইবার জন্য মাটীর ভারী কড়া, সৌখীনলোকদের খেলার জন্য মাটীর (ও পাথরের) পাশা ও ঘুঁটি প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। অবস্থাপন্ন লোকদের জন্য মোহেন্-জো-দড়োতে মৃত্তিকাকেই কাচবৎ চক্‌চকে ও মসৃণ করিয়া যে নানারূপ দ্রব্য নির্ম্মিত হইত, এইরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধুপত্যকার কাচবৎ মৃৎপাত্রই (glazed pottery) যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন, ইহা বিশেষজ্ঞেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।[১]

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও

Marshall, M. I. C., Vol. I. p. 38 ; Mackay, Vol II, pp. 578, 581.

বৈদিক সাহিত্যে কুলাল (potter)[1] কুলালচক্র[2] (potter's wheel) প্রভৃতি এবং বহু মৃৎপাত্রের নাম ও বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিন্ধুপত্যকায় আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের ন্যায় বহু পাত্রই বৈদিকযুগে যাগ-যজ্ঞ কিংবা দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। প্রায় ৩০।৪০ প্রকারের পাত্র বৈদিক ঋষিরা ব্যবহার করিতেন। এইগুলির মধ্যে পানীয়ের জন্য পাত্র[3] (drinking vessel) পুরোডাশের·(sacrificial cake) জন্য 'পাত্রী'[4] (vessel) এবং ব্রহ্মৌদনের জন্য 'পাজক'[5] (dish ?) শস্য-পরিমাপ[6] কিংবা অগ্নি-প্রণয়নের জন্য শরাব (saucer) ব্যবহৃত হইত। জলের জন্য কুম্ভ বা কলস, দধি-দুগ্ধ রাখিবার এবং গো-দোহনের নিমিত্ত 'কুম্ভী' (small round jar) ছিল। আরও এক প্রকার কুম্ভী থাকিত। ইহাতে পশু-রন্ধন হইত বলিয়া ইহাকে পশু-কুম্ভী বলিত। জল সেচন করার জন্য বড় বড় ঘট থাকিত, ঐগুলিকে 'পরিসেচন-ঘট' বলা হইত। রন্ধন এবং দ্রব্যাদি উত্তপ্ত করার জন্য স্থালীর[7] ব্যবহার ছিল। স্থালী মাটী দিয়া কিংবা হয়ত তাম্র দিয়াও নির্ম্মিত হইত।

[1] Vāj-Saṃ. XVI. 27.

Raghu Vira, Implements & Vessels used in Vedic Sacrifice, JRAS, Part II, April, 1934, pp. 283 ff.

[2] Sat. Br. XI. 8. 1. 1.

[3] RV. 1. 82. 4, '110, 5.' II. 37. 4, etc. A. V. IV. 17. 4. VI. 142. 1, etc. Tait. Saṃ., V. 1. 6. 2. 'VI. 3. 4. 1.' Vāj. Saṃ. XVI, 62, XIX. 86 etc.

[4] Ait. Br. VIII. 17. Sat. Br. I. 1. 2. 8. Sāṅkh. Sr. Sūtra. V. 8. 2. *Cf.* Zimmer, Altindische Leben. 271.

[5] Ap. Sr. Sūtra. Monier Williams' Dictionary, S. V.

[6] Tait. Br. I. 3. 4. 5. 6. 8. Sat Br. V. 1. 4. 12.

[7] A.V.VIII. 6. 17. Tait. Saṃ. VI., 10. 5. Vāj. Saṃ. XIX. 27. 86, etc.

বৈদিক আর্য্যরা মৃৎপাত্রের ভগ্ন খণ্ডগুলিও ফেলিয়া দিতেন না। ঐগুলিতে করিয়া তাঁহারা পুরোডাশ (পিষ্টক) প্রভৃতি অগ্নিতে সেঁকিতেন। এই ভগ্ন খণ্ডকে তাঁহারা 'কপাল' বলিতেন। আর্য্যরা যে সব মৃৎপাত্র ব্যবহার করিতেন হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর অধিবাসীরা তাহাদের চেয়ে কোন অংশে হীন বা অল্প সংখ্যক পাত্র ব্যবহার করিত বলিয়া অনুমিত হয় না। এইগুলির নমুনা এত বেশী ও সংখ্যা এত অসীম যে ভগ্ন পাত্রখণ্ডও তাঁহাদের কাছে অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া মনে হয় না। তবে ভগ্ন শরা কিংবা মৃৎ-পাত্রের বৃহৎ খণ্ড এখনও পল্লীগ্রামে পিষ্টকাদি সেঁকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখনও শরা এবং মৃৎ-কপাল বঙ্গ দেশের পল্লীগৃহে পিষ্টকাদি-নির্ম্মাণের কালে পুরাকালের বিলীন স্মৃতি সঞ্জীবিত করিয়া দেয়। এই সব আচার-ব্যবহারের মূল সূত্র কোথায়? আর্য্য সভ্যতায়, না সিন্ধু সভ্যতায়?

হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর প্রায় সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যই কুমারের চাকায় তৈরী। মূর্ত্তি এবং খেলনা ছাড়া হস্ত নির্ম্মিত দ্রব্যের সংখ্যা অতি সামান্য। ঋগ্বেদে কুলাল চক্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার বিষয় প্রথম জানা যায়। তবে উল্লেখ নাই বলিয়াই যে ঋগ্বেদের আর্য্যেরা ইহার ব্যবহার জানিতেন না এরূপ অনুমান করাও অন্যায়। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার কুম্ভকার যে মৃৎ-শিল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাত্রের বহির্দ্দেশের মসৃণতা, ভিতরের অসংখ্য সমান্তরাল সূক্ষ্ম রেখা এবং ঘূর্ণ্যমান চক্র হইতে রজ্জুর সাহায্যে পাত্র পৃথক্-করণের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। হস্ত-নির্ম্মিত পাত্রে এই সব চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে না।

সিন্ধ্‌ৃপত্যকায় সাধারণতঃ মৃৎপাত্রগুলি লাল করিয়া পোড়ান হইত। শতকরা নিরনব্বইটী এরূপ লাল। ধূসর বা পাংশু রংয়ের মৃত্তিকা দিয়াও সময় সময় পাত্রাদি তৈরী হইত।[১] পুরু ও পাতলা প্রভৃতি নানারূপ পাত্র এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কখন কখন ডিমের খোলার মত মসৃণ ও পাতলা পাত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্রের আয়তন-অনুসারে শিল্পীরা পুরু এবং পাতলা ভাবে নির্ম্মাণ করিত। এই স্থানের পাত্রের উপাদানের মধ্যে অর্থাৎ মৃত্তিকার সঙ্গে অভ্রযুক্ত বালি বা চূণ কিংবা উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃৎপাত্র আবার নানাভাবে তৈরী হইত। কোনটী এক সঙ্গেই ঘূর্ণ্যমান চক্রে নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছুরি কিংবা রজ্জু দিয়া তলা কাটিয়া পৃথক্ করা হইত। আবার কোন কোন পাত্র দুই খণ্ডে নির্ম্মিত হইত। পাত্রের মাথা ও গলা স্বতন্ত্রভাবে নির্ম্মাণ করিয়া, খণ্ডদ্বয় শুষ্ক হওয়ার পূর্ব্বেই গলার সঙ্গে মাথার দিক্‌টা চক্রে চড়াইয়া সংযুক্ত করিতে হইত।[২] ইহাতে গলার দিকে কোণের সৃষ্টি হইয়া পাত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইত। পাত্র নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে ইহার বহির্দ্দেশে লাল কিংবা ঈষৎ পীত রংয়ের প্রলেপ লাগাইয়া স্বাভাবিক লালকে আরও উজ্জ্বল লাল কিংবা পীতাভ করা হইত। এখনও বঙ্গদেশে এবং অন্যত্র পাত্রের উপর ও গলার দিকে এইরূপ রং দেওয়ার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

[১] কিশ্ নগরে সারগোন নামক রাজার পূর্ব্বে এইরূপ পাত্রের প্রচলন ছিল।

[২] এইরূপ পাত্র প্রাচীন কিশ্, জামদেত্‌নসর, সুসা ও মুস্তান্ নগরেও নির্ম্মিত হইত।

পাত্রে সাজ দেওয়াও শিল্পকর্ম্মের আর একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। সজ্জাযুক্ত পাত্র লোক-সমাজে আদরের সামগ্রী ছিল। নানা উপায়ে এই সাজ দেওয়া হইত। এক প্রকার নিয়ম এই যে ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপরিস্থিত পাত্রের বহির্দ্দেশে একটা রজ্জু বাঁধিয়া দিলেই, এই পাত্রের গায়ে সুন্দর রজ্জু-চিহ্ন অঙ্কিত হইত।[১] ইহাতে পাত্রের শোভা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইত। দ্বিতীয়তঃ পাত্র সম্পূর্ণ হইয়া গেলে শুষ্ক হওয়ার পূর্ব্বেই ইহাতে নানারূপ চিহ্ন ক্ষোদিত করা হইত। মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎপাত্রে পরস্পর ছেদনকারী বৃত্ত-চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।[২] কোন গোলাকার দ্রব্যের সাহায্যে এই বৃত্ত-চিহ্ন ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পাত্রে, অর-যুক্ত চক্রের মত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।[৩] আবার অর্দ্ধ-চক্রাকার নখচিহ্নবৎ সজ্জাও সিন্ধুপত্যকায় বিরল নহে।[৪] মৃৎপাত্রের অনুকরণে ফায়েন্স (faience) পাত্রেও যে সজ্জা হইত, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পাতেই পাওয়া যায়।

কোন কোন পাত্রের বাহিরের দিকে দানা-দানার মত আছে; আবার সময় সময় ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপর নির্ম্মীয়মান পাত্রের গায়ে অঙ্গুলি-সংযোগে নানারূপ সজ্জার সৃষ্টি করা

১ মেসোপটেমিয়াতে পাত্রের গায়ে এইরূপ রজ্জু-চিহ্ন খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। M. I. C., Vol. I. P.291.

হরপ্পাতেও এইরূপ সজ্জাযুক্ত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২ M. I. C., Vol. III. Pl. CLVII. Nos. 2-4, 5.

৩ M. I. C., Vol. III. Pl. CLVII. No 1.

৪ *Ibid*, Nos. 3. 7.

হইত। কোন কোন পাত্রের বহির্দ্দেশে চিত্রাক্ষরে কুম্ভকারের চিহ্ন কিংবা শীলমোহরের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মৃৎপাত্রের নমুনা :—উৎসর্গ-পাত্র বা নৈবেদ্য-পাত্র এখানে তিন প্রকার দেখা যায় :

(ক) চেপটা-তলা-বিশিষ্ট [১]

(খ) সাজসজ্জাহীন-লম্বা-দণ্ডযুক্ত [২]

(গ) ছাঁচে-ঢালা-দণ্ডযুক্ত [৩]

প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিত্তনল্লুর নামক স্থানে যে মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও উৎসর্গ-পাত্র আছে। কিন্তু ঐগুলির মাথায় মাটীর থালা সংযুক্ত নাই, পরন্তু মোহেন্-জো-দড়োর উৎসর্গ-পাত্রে থালা সংযুক্ত থাকিত। বাহিরের আকৃতিতে ঐগুলিকে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।[৪]

মৃত্তিকা ছাড়া, তামা ও ব্রোঞ্জ্ দ্বারাও উৎসর্গ-পাত্র মোহেন-জো-দড়োর সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা নির্ম্মাণ করাইতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তাম্র-প্রস্তর যুগে জগতের বহু সভ্যদেশে অর্থাৎ মিসর, এলাম (Elam), সুমের (Sumer), আনাউ (Anau), ক্রীত্ (Crete), হিসার্লিক (Hissarlik), ট্রান্সিল্ভানিয়া (Transylvania) এবং আল্ত্-(Alt)-উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন আকারের উৎসর্গাধারের বহুল প্রচলন দেখা

[১] M. I. C., Vol III. Pl. LXXVIII. No. 8. LXXIX. No. 2;5.

[২] *Ibid*, Pl. LXXIX. No. 1 ; 17.

[৩] *Ibid*, Pl. LXXIX. No. 21 ; 22 ; 23.

[৪] Arch. Sur. Rep., 1903-4 PL LVII. Fig. I. 7-11

যায়। তবে কিশ্ এবং মোহেন্-জো-দড়ো নগরের নৈবেদ্যাধারের মধ্যেই আকারের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। লম্বা নৈবেদ্যাধার মেসোপটেমিয়াতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হইত। উর্-নগরেও উৎসব-উপলক্ষে ইহাদের ব্যবহার ছিল। সুসা-নগরে ইহা সময় সময় হস্তে ধারণ করিয়া লোকেরা মিছিলে যোগদান করিত বলিয়া ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেন।[১] মোহেন্-জো-দড়োতে ও হরপ্পাতে এই সব নৈবেদ্যাধার সম্ভবতঃ নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ এবং দৈনন্দিন কার্য্য এই উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইত বলিয়া তাঁহার ধারণা।[২]

পাত্র

সরু-তলার পেটে-খাঁজকাটা একরূপ নাতিবৃহৎ পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি সংখ্যায় অজস্র। সিন্ধু-পত্যকায় পুরা কালে এইরূপ হাজার হাজার পাত্র ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। এইগুলির মূল্য খুব কম ছিল, এবং অতি সামান্য কাজের জন্যই ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে শিল্প-নৈপুণ্য বা সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। বাহিরের দিক্ অন্যান্য পাত্রের মত মসৃণ নয়। তিন চারি বা পাঁচটি ব্যাবর্ত্তিত রেখা (spiral) দ্বারা বাহিরের খাঁজগুলি গঠিত। ভিতরেও এই রূপ আঙ্গুলের রেখা দেখা যায়। সরু-তলা বলিয়া এইগুলি মাটীতে বসাইয়া রাখা যায় না। এই পাত্র উৎসবাদিতে নিমন্ত্রিতের জল পানের জন্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা স্থায়ী ব্যবহারে লাগিলে হয়ত সংখ্যায়

[১] M. I. C., Vol. I, p. 296.
[২] *Ibid*, p. 296.

এত বেশী পাওয়া যাইত না। স্থায়ী ব্যবহারের পাত্র সাধারণতঃ দেখিতে ভাল ও মজবুত হইত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পান-ভোজনের পর বোধ হয় এই পাত্র ফেলিয়া দেওয়া হইত। আজকালও বঙ্গদেশে কিংবা উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে পানাহারের জন্য মৃৎপাত্র একবার ব্যবহার করিয়াই পরিত্যাগ করা হয়। শক্ত খাদ্য-দ্রব্য পাতায় রাখা যায়, কিন্তু তরল জিনিস ও জলের জন্য পাত্রের দরকার, সেই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সম্ভবতঃ পৃথক্ পৃথক্ পাত্র দেওয়া হইত। এইরূপ পাত্র সিন্ধু-উপত্যকায় এক এক স্থানে স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। তলা সরু দেখিয়া মনে হয় ইহা উল্টাইয়া রাখা হইত এবং জল পানের সময় নিম্নদেশে ধরিয়া পান করা হইত। মৃৎপাত্র এইরূপ উল্টাইয়া রাখার নিয়ম কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক প্রকার পান-পাত্র এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলিকে "চষক" বলা যাইতে পারে। এইরূপ দ্রব্যকে ইংরেজীতে 'বীকার' (beaker) বলা হয়। এইগুলি দেখিতে খুব সুন্দর ও মসৃণ। তলা চেপ্টা বলিয়া ইহাদিগকে গেলাসের মতও বসাইয়া রাখা যায়। ইহাদের সংখ্যাও খুব বেশী। অভিজাত সম্প্রদায়ের পানীয়ের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়।

খুরা-ওয়ালা পাত্রও (pedestal vases) এখানে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। রন্ধন-ক্রিয়া কিংবা অন্য দ্রব্যাদি রাখার জন্য বোধ হয় এইগুলি ব্যবহৃত হইত।[১]

[১] M. D. III. Pl. LXXX, 23-34.

এখানকার কানাওয়ালা উদ্গত-গল কলস (ledge-necke jar) দেখিতে খুব সুন্দর। এই শ্রেণীর মৃৎপাত্র মোহেন্-জো দড়োতে সংখ্যায় খুব কম। হরপ্পাতেও এই নমুনার দ্রব পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ পাত্রের গলা এবং নিম্ন দেশ পৃথব পৃথক্ নির্ম্মাণ করিয়া পরে জোড়া দেওয়া হইত।[১]

শিরওয়ালা পাত্র (ribbed vases) এখানে বিরল, কিন্তু মাঝে মাঝে চমৎকার দুই চারিটী নমুনা পাওয়া যায়।[২]

ভাণ্ডাকৃতি পাত্র (vase-like jar) ছোট বড় নানা প্রকার আছে। এইগুলির তলা চেপ্‌টা এবং সময় সময় পেটে খাঁজ কাটা থাকে। এই নমুনার পাত্রের সংখ্যাও খুব প্রচুর।[৩]

ছোট ঘট,[৪] লম্বা ভাঁড়,[৫] সরু-মুখ[৬] ও সরু-তলার[৭] পাত্রও অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আরও এক প্রকার পাত্র আছে; এগুলির স্কন্ধদেশ খুব প্রশস্ত।[৮] এমন কি এইসব পাত্রের স্কন্ধদেশ উচ্চতার চেয়েও অধিক প্রশস্ত হইত। সরু-তলার আর এক প্রকার মৃৎপাত্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি দেখিতে অনেকটা গামলার মত[৯] এবং সংখ্যায় খুব কম।

ছোটখাটো সাদা এবং রঙ্গীন নানা রূপ পাত্র আছে। ঐগুলি দেখিতে খুব চমৎকার। এই সব কি উদ্দেশ্যে যে

১ M. I. C., Pl. LXXX. 35-37.
২ *Ibid*, Pl. LXXX. 38-42.
৩ *Ibid*, Pl. LXXX. 43-70.
৪ *Ibid*, pl. LXXXI. 1-10.
৫ *Ibid*, 11,-12.
৬ *Ibid*, 13-17.
৭ *Ibid*, 18-20.
৮ *Ibid*, 21-26.
৯ *Ibid*, 27-31.

ব্যবহৃত হইত ঠিক বুঝা যায় না। গৃহসজ্জা কিংবা প্রসাধন-দ্রব্য রাখার জন্য হয়ত এই জাতীয় পাত্রের ব্যবহার হইত।[১]

পুরুতলা বিশিষ্ট পাত্র[২] (heavy-based ware) ডাবর,[৩] পাউলি[৪] (কানাওয়ালা পান-পাত্র) ও চওড়া-মুখ প্রভৃতি নানারূপ পাত্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

রঙীন পাত্র

সিন্ধুপত্যকায় নানাজাতীয় পুরাবস্তুর সঙ্গে অসংখ্য ভগ্ন রঙীন পাত্রের খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। অক্ষত অবস্থায় কোন রঙীন পাত্র কদাচিৎ পাওয়া যায়। নগরের বিভিন্ন স্তর হইতে এইগুলি উদ্ধৃত হইলেও মূলতঃ রং কিংবা চিত্রে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় মোহেন্-জো-দড়ো-সভ্যতার আবির্ভাব, স্থিতি, পরিণতি ও পতনের মধ্যে ব্যবধান অতি দীর্ঘকালের নয়।

রঞ্জন-শিল্পে মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত ছিল। পরস্পরচ্ছেদক বৃত্ত ও অন্যান্য জ্যামিতিক চিত্র দেখিলেই তাহাদের পরিপক্ক হস্তের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে শিল্পীর তুলির স্থূল ও অযত্নসাধিত রেখা দেখিয়া মনে হয় অতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে এই

১ M. I. C., III. Pl.LXXXI. 32. *Ibid*, 33-40.

২ *Ibid*, 41-45.

৩ *Ibid*, 46-49.

৪ *Ibid*, 50-52.

৫ *Ibid*, 53-60.

শিল্প মোহেন্-জো-দড়ো কিংবা অন্যত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া, ক্রমে অধোগতির দিকে যাইয়া নির্জীব অনুকরণের বাঁধাবাঁধি সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। মোহেন্-জো-দড়োর, ও সমসাময়িক আন্তর্জ্জাতিক রঞ্জন-শিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মোহেন্-জো-দড়োর শতকরা আশীটী চিত্রই পুরু পাত্রের উপর এবং অবশিষ্টগুলি পাতলা ভাণ্ডের উপর অঙ্কিত হইত। কিন্তু সুসা (Susa), নাল (Nal) ও সিস্তান (Sistan) প্রভৃতি স্থানে ঠিক ইহার বিপরীত; সেখানে শতকরা আশীটী চিত্রই পাতলা পাত্রের উপর অঙ্কিত হইত।

সিন্ধুপত্যকার রঙ্গীন পাত্রের মৃত্তিকায় অভ্র, বালি, চূণ ও নানারূপ ময়লা দেখিতে পাওয়া যায়। জামদেত্ নস্র (Jamdet Nasr)-এর রঙ্গীন পাত্রের মৃত্তিকায় সাধারণতঃ বালি ও চূণ এবং সুসায় দ্বিতীয় যুগে চূণ থাকিত। মোহেন্-জো-দড়োতে অধিকাংশ স্থলে শুধু এক প্রকার রং অর্থাৎ লালের উপর কাল ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বেলুচিস্থানে যদিও চিত্রের নমুনা মোটামুটি একই প্রকার তথাপি সেখানে এক জাতীয় রংয়ের পরিবর্ত্তে নানাবিধ রং ব্যবহৃত হইত। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে বহু রংয়ের ব্যবহার অল্পসংখ্যক পাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রং প্রয়োগ সম্বন্ধে দেখা যায়, লাল রংয়ের শক্ত পোড়া পাত্রের উপর কাল, পোড়া লাল, কটা লাল এবং সিঁদুর-রং প্রভৃতির একটী বা দুইটী একসঙ্গে ব্যবহৃত হইত। পাত্রের গায়ে পাতলা লাল (light red), পোড়া লাল (dark red), পাটল রং (pink), ঈষৎ পীত (cream) এবং পীতাভ ধূসর প্রভৃতির আস্তরণ (slip) লাগাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত রং প্রয়োগ করা হইত। পারস্য (সুসা) ও মেসোপটেমিয়ায় ঐ সময়ে

পাণ্ডু (pale) রংয়ের এবং বেলুচিস্থানের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে এই সব দেশের প্রভাবে পীতাভ ধূসর রঙ এবং পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব বেলুচিস্থানে মোহেন্-জো-দড়োর প্রভাবে লাল রংয়ের প্রলেপ ব্যবহৃত হইত। বেলুচিস্থানের দিকে বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এই দেশ, ভারতীয় এবং মেসোপটেমিয়া-পারসীক সভ্যতার সংযোগবাহক; এখনও উভয় সভ্যতার প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন বহুল পরিমাণে এখানে আবিষ্কৃত হইতেছে। মোহেন্-জো-দড়োর রঙ্গীন পাত্রে মোটামুটি দুই প্রকার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়:—(১) জ্যামিতিক ও (২) প্রাকৃতিক। জ্যামিতিকের মধ্যে সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত প্রভৃতি দেখা যায়। প্রাকৃতিকের মধ্যে সাধারণতঃ ফল, ফুল, বৃক্ষ, লতা এবং চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, মৎস্য-শল্ক ও বন্যছাগ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হইত।

জ্যামিতিক সরল ও বক্ররেখাদ্বারা নানারূপ নূতন নূতন চিত্র সৃষ্টি হইত। আঁকাবাঁকা রেখা সাধারণতঃ পাত্রের কিনারা (border) অঙ্কনের জন্য ব্যবহৃত হইত। মিসরেও খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রক হইতে কিনারায় এইরূপ আঁকাবাঁকা রেখা-অঙ্কনের প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। গোলার্দ্ধ (hemispherical), যব বা মালা, ত্রিভুজ, বৃত্ত, বলয় ও শতরঞ্চ খেলার ছক প্রভৃতির চিত্রও এখানে অঙ্কিত হইত। শরার (saucer) ভিতর দিকে বৃত্তাদির চিত্র দেখা যায়। পাত্রের গায়ে পরস্পরচ্ছেদকবৃত্ত (intersecting circles), তরঙ্গাকার রেখা, সূর্য্য, তারকা, বন্যছাগ, মেরু, বৃষ, শতরঞ্চের ছক, পশুচর্ম্ম, শল্ক, বৃক্ষ, পাত্র (vase), অশ্বত্থ বৃক্ষ ও পত্র, চিরুনি, পাখী, চক্র, স্ক্রু (screw), দ্বিমুখ কুঠার (double axe), জাল, মুকুল, ময়ূর, পদ্ম, সর্প, বৃষ ও

হরিণ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে। রেখা, বৃত্ত, শঙ্ক, বৃক্ষ লতা, গুল্ম প্রভৃতি চিত্রে কতকাংশে মিসরের সঙ্গে এবং এই সমস্ত ও অন্যান্য চিত্র-বিষয়ে বেলুচিস্থান, পারস্য ও মেসো- পটেমিয়া প্রভৃতির সঙ্গে বহুল পরিমাণে তাম্র-প্রস্তর যুগের সিন্ধুপত্যকার সাদৃশ্য ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

শীলমোহর

মোহেন্-জো-দড়োর স্তূপসমূহে খননের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য-শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শীলমোহরের অক্ষর এবং ভাষা আজও পর্য্যন্ত জগতের পণ্ডিত-সমাজে দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া সকলের বিস্ময় এবং কৌতূহল উৎপাদন করিতেছে। অধিকাংশ শীলমোহরই নরম পাথরের তৈরী। ইহা ছাড়া পোড়ামাটী, মণ্ড (paste), তামা, ব্রোঞ্জ ও কাল মর্ম্মর প্রভৃতির শীলমোহর ও তাহার ছাপ (sealing) দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিতে অক্ষর ছাড়া একশৃঙ্গযুক্ত পশু (unicorn), হাতী, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ, হরিণ, ছাগল, ঘড়িয়াল-কুমীর, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প ও কিম্ভূতজীব প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন কোন শীলমোহরে দেবদেবী ও মানুষের মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোন কোন মূর্ত্তি শৃঙ্গযুক্ত। একটী শীলমোহরে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ ও হরিণ-পরিবেষ্টিত যোগাসনে[১] উপবিষ্ট[২] একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কেহ কেহ

[১] M. I. C., Vol. I. u. el. XII. Fig. 17.

[২] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে এই আসন পরবর্ত্তী যুগের কূর্ম্মাসনের অনুরূপ। উহা যোগাসনেরই অন্তর্ভুক্ত।

মহাযোগী পশুপতি শিবের আদি অবস্থা দেখিতে পান। অধিকাংশ শীলমোহরে একশৃঙ্গযুক্ত পশুর (unicorn) ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই অদ্ভুত জীবের কোনও সময়ে যে কোথাও অস্তিত্ব ছিল তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন প্রকৃতপক্ষে শীলমোহরে অঙ্কিত এই গবাকার পশুটার একটী মাত্র শৃঙ্গ নয়। ছবিতে ইহার পার্শ্ব (profile) দেখান হইয়াছে বলিয়া একটী শৃঙ্গ দেখা যায়, পিছনের শৃঙ্গটী সামনেকার শৃঙ্গের দ্বারা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

অন্যান্য জীবজন্তুর যে সব চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, সমস্তই যেন জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শীলমোহরে জীবজন্তুর চিত্র-অঙ্কন-কার্য্যে মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা যে সিদ্ধহস্ত ছিল সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তামা ও ব্রোঞ্জের পাতে অঙ্কিত প্রাণীদের চিত্রগুলির মধ্যে সময় সময় শিল্পী বিশেষ পরিপক্ক হস্তের পরিচয় দিতে পারে নাই; এবং ইহাদের ছবিতে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা পাইলেও, পাথরের শীলমোহরে অঙ্কিত ছবির মত উচ্চাঙ্গের হয় নাই। শীলমোহর-গুলিকে আমরা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি :—

(১) লেখময়,

(২) রূপ বা চিত্রময়

(৩) রূপ ও লেখ উভয় যুক্ত

চিহ্ন কিংবা চিত্র-বর্জ্জিত বহু শীলমোহরও সিন্ধুপত্যকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শীলমোহরের মালিকের নাম কিংবা অন্য কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ও হয়ত থাকিতে পারে।

শীলমোহরে অঙ্কিত চিত্র—

দ্বিতীয় শ্রেণীর শীলমোহরে মালিকের বক্তব্য বিষয় ছাড়া গরু, মহিষ, ছাগল, হরিণ, গণ্ডার, দেবতা, দানব ও মানব প্রভৃতির চিত্র নানা ভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে। কোন কোন শীলমোহরে গরুর সম্মুখে একটা গামলার মত কিছু রহিয়াছে। ইহা তাহার খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র বলিয়া মনে হয়। শীলমোহরে ক্ষোদিত পশু-মূর্ত্তির মধ্যে এক-শৃঙ্গ-যুক্ত পশু-মূর্ত্তিই (unicorn) অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডার ও খর্ব্ব-শৃঙ্গযুক্ত গরুর সম্মুখ ভাগেই প্রধানতঃ খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র দেখা যায়। কোন কোন শীলমোহরে লাঙ্গুল-যুক্ত এক নরাকৃতি শৃঙ্গীকে [১] ব্যাঘ্রের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপৃত অবস্থায় অঙ্কিত করা হইয়াছে; এইরূপ শৃঙ্গ ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট নর-মূর্ত্তিকে মেসোপটেমিয়ার বীর গিল্‌গামেশের (Gilgamesh) সহচর এন্‌কিদু (Enkidu)-এর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এন্‌কিদুরও মুখ, স্কন্ধ ও বাহু মানুষেরই মত, কিন্তু মাথায় শৃঙ্গ দুইটী গরুর মত। শীলমোহরের হাতী এবং ককুদ্বান্ বৃষ বিশেষ ভাবে শিল্পীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহাদের চিত্র নিখুঁত। কল্পিত চিত্র-অঙ্কনেও মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীরা পশ্চাৎপদ ছিল না। শীলমোহরের কোন কোন চিত্রে মেষের দেহে মানুষের মুখ, গরুর শিং ও হাতীর শুঁড় এবং দাঁত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সব চিত্রেই আবার পশ্চাদ্ভাগ ও পিছনের পদদ্বয় ব্যাঘ্রের মত দেখা যায়।[২]

১ M. L. C. Vol. III. Pl. CXI, Nos. 356-58.

২ *Ibid*, Pl. CXII, Nos. 376-81

শিল্পী আবার একটী চিত্রে একশৃঙ্গীর (unicorn) দেহে হরিণের তিনটী মস্তক ও শৃঙ্গ যোগ করিয়া দিয়া এক অদ্ভুত প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছে।[১] আর একটী ছবিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এক অঙ্গুরীয় চিহ্ন হইতে ছয়টী প্রাণীর মস্তক বাহির হইয়াছে। ইহাতে একশৃঙ্গ পশু (unicorn), খর্ব্বশৃঙ্গ বৃষ, হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানারূপ জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে।[২] জীব-জগতের অনেক প্রাণীই মোহেন্-জো-দড়োর শিল্পীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন শীলমোহরে কিংবা খেলনায় সিংহমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সমসাময়িক এলাম, সুমের ও কিশ্ প্রভৃতি স্থানে সিংহ-মূর্ত্তি যুক্ত প্রাচীন শীলমোহর বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। মোহেন্-জো-দড়োতে ব্যাঘ্রই অন্যান্য দেশের সিংহ-মূর্ত্তির স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃক্ষাদির চিত্রও শীলমোহরে স্থান পাইয়াছে। একটী চিত্রে কল্পিত অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যভাগ হইতে একশৃঙ্গীর (unicorn) দুইটী মাথা দুই দিকে বাহির হইয়াছে বলিয়া অঙ্কিত হইয়াছে।[৩] কোন কোন চিত্রে বাবুল বা ঝাঁউ বৃক্ষও অঙ্কিত রহিয়াছে।[৪]

তামার বা ব্রোঞ্জের পাতে অঙ্কিত ছবির মধ্যে পূর্ব্ব-লিখিত বহু ছবিই দেখিতে পাওয়া যায়; অধিকন্তু খরগোস[৫] ও বানর(?)

[১] M. I. C., Pl. CXII. No. 382

[২] *Ibid*, Pl. CXII. No. 383.

[৩] *Ibid*, Pl. CXII. No. 387.

[৪] *Ibid*, Nos. 352, 353, 355, 357.

[৫] *Ibid*, Pl. CXVII. Nos. 5, 6.

প্রভৃতি জন্তুর আকৃতিও কোন কোন ফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে।[১]

এই সব ছাড়া আর একটী তাম্রফলকে মানুষের একটী আশ্চর্য্য ছবি অঙ্কিত আছে।[২] দেখিলে ইহাকে ব্যাধ বলিয়া মনে হয়। হাতে তীর-ধনুক রহিয়াছে, মস্তকে শৃঙ্গ, আর পরিধানে পত্র-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ। সহজে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় জীবজন্তুর কাছে গিয়া শিকার লাভ করাই বোধহয় এই পরিচ্ছদ পরিধানের উদ্দেশ্য ছিল। মস্তকে শৃঙ্গ থাকায় ইহাকে ব্যাধরূপী দেবতা বলিয়া মনে হয়, কারণ মস্তকের শৃঙ্গ ঐ যুগে দেবত্বের পরিচায়ক ছিল।

পাথর, তামা ও ব্রোঞ্জেই বহুল-পরিমাণে সিন্ধুপত্যকার লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত মৃৎপাত্রের গায়েও শীলমোহরের ছাপ রহিয়াছে।

ফায়েন্স্ এবং পোড়া মাটী-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিরামিডের অনুকারী দ্রব্য, চতুষ্কোণ ফলক ও চক্রাকার তল সমূহেও শীলমোহরের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিন্ধুপত্যকার শীলমোহরের উদ্দেশ্য এ যাবৎ নিরূপিত হয় নাই। ইহাদের পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিষয় জগতের একটা জটিল সমস্যা হইয়া থাকিবে। অন্যান্য প্রাচীন দেশে যে সব শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির ছাপও (sealing) পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ মাটীর ছোট ফলকে এই ছাপ দিয়া উক্ত ফলক মৃৎপাত্রের

১ ডাঃ ম্যাকে বলেন যে একটা অস্পষ্ট তাম্রফলকে বানরের আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ফায়েন্স, পোড়ামাটী, ও মণ্ডনির্ম্মিত এইরূপ বানর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২ M. I. C., Vol. III. Pl. CXVII. No. 16.

গায়ে কিংবা অন্য পণ্য-জাতের মধ্যে সূতা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। যে দ্রব্যে বন্ধন করা হইত সেই দ্রব্যের চিহ্ন এখনও কোন কোন ফলকে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মোহেন্-জো-দড়োতে যে সব শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাদের অবিকল ছাপ এখনও পাওয়া যায় নাই। পোড়ামাটী ও ফায়েন্সের মাত্র কয়েকটী ছাপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি সংখ্যায় এত অল্প যে ইহাদের দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ পণ্যদ্রব্যের উপর ছাপ দিবার উদ্দেশ্যেই এই হাজার হাজার ছোট-বড় শীলমোহর ক্ষোদিত করার ব্যবস্থা হইয়াছিল তবে এইগুলির প্রতিচ্ছবি এখন কোথায়? এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর এখনও কেহ দিতে পারেন নাই। মিঃ ম্যাকে বলেন এ দেশের আবহাওয়া আর্দ্র বলিয়া শীলমোহরের ছাপ-বিশিষ্ট মৃৎ-ফলক-সমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই মোহেন্-জো-দড়োর চেয়ে অধিক আর্দ্র মজঃফরপুর জেলার বসাঢ় ও গোরখপুর জেলার কাসিয়া এবং পাটনা জেলার নালন্দা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত পরবর্ত্তী কালের মোহরের মাটীর ছাপ বেশ অক্ষত অবস্থায় আছে। সুতরাং মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের মধ্যে মাটীর উপর ছাপ দেওয়ার প্রথা বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল এবং আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মাটী ছাড়া শিলাজতু (bitumen) এবং রজনের (resin) উপর ছাপ দেওয়ার প্রচলন হয়ত ছিল এবং দীর্ঘ কালের আবর্ত্তনে এই সব জিনিস বিকৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিঃ ম্যাকে অনুমান

করেন। এই অনুমানের মধ্যে হয়ত সত্য থাকিতে পারে, কারণ বর্ত্তমান যুগের গালার মত প্রাগৈতিহাসিক যুগেও অগ্নির উত্তাপে নরম করিয়া ছাপ দেওয়ার উপযুক্ত দ্রব্যের আবিষ্কার ও ব্যবহার মোহেন্-জো-দড়োর উন্নত সভ্য নাগরিকদের পক্ষে কল্পনার অতীত জিনিস নয়। তবে উক্ত বিষয়ে এই বলা যাইতে পারে যে শিলাজতুর ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা এই স্থানেই এক জলাশয়ের দেয়ালের গায়ে পাইয়াছি, কিন্তু রঞ্জনের কোন চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায় নাই; এবং এইগুলি ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মাটী যে শীলমোহরের ছাপের জন্য ব্যবহৃত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে শীলমোহরের ছাপ-যুক্ত ছোট কয়েকটী মৃৎ-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকন্তু ডাঃ শাইল্-ও (Dr. Scheil) বাবিলোনিয়ার য়োখ্ (Yokh) নামক স্থানে প্রাপ্ত মোহেন্-জো-দড়োর বৃষের ছবি ও চিত্রাক্ষর যুক্ত একটী পোড়া মাটীর শীলমোহরের ছাপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[১] ইহা ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত কোন বস্তাবিশেষের গায়ে আবদ্ধ ছিল বলিয়া চিহ্নও নাকি পাওয়া যায়। বিদেশে রপ্তানীর পণ্যদ্রব্যে ছাপ দেওয়ার জন্য যে কোন কোন শীলমোহর কাটা হইয়াছিল, সে অনুমান হয়ত অমূলক হইবে না।

প্রাগৈতিহাসিক ভারতবাসী বেলুচিস্থান, পারস্য ও

[১] Revue d'Assyriologie, XXII. 2 (1925).

মেসোপটেমিয়ার অতি প্রচীন সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে যে ব্যবসায় বাণিজ্যের একসূত্রে আবদ্ধ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় মোহেন্-জো-দড়ো হইতে সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানের সীমা পর্য্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু স্তূপ ও সার্থবাহ পথ (caravan route) আবিষ্কার করিয়াছেন। স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্-ও (Sir Aurel Stein) বেলুচিস্থানের মধ্যে এরূপ বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই সমসাময়িক সভ্য জাতিদের সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরাও যে ব্যক্তিগত কিংবা সংঘগত শীলমোহরের ছাপ পণ্য-দ্রব্যের উপর ব্যবহার করিত সে বিষয়ে অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক।

কেহ কেহ আবার এরূপ অনুমানও করেন যে কোন কোন জিনিসে রংয়ের ছাপ দেওয়ার জন্য শীলমোহর কাটা হইয়াছিল। এই অনুমানের মূলে সন্তোষজনক যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ রংয়ের ছাপের জন্য এইগুলির ব্যবহার অভিপ্রেত হইলে, প্রাণীর ছবিগুলি এত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে ক্ষোদিত হইত না। যেহেতু সমান জিনিসের উপর নীচের সূক্ষ্ম অবয়বের ছাপ বসিবে না, সুতরাং ইহারা রংয়ের ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয়।

কাহারও কাহারও মতে শীলমোহরগুলি হয়ত মাদুলি কিংবা রক্ষা-কবচের ন্যায় গলায় বা বাহুতে ধারণ করা হইত। কিন্তু ইহাদের কোন কোনটী এত বড় ও ভারী যে গলায় বা বাহুতে ধারণ করা অসম্ভব। অধিকন্তু ঐ শীলমোহরগুলির পশ্চাদ্দিকে আঙ্গুল দিয়া ধরার জন্য হাতল বা আংটীর মত

উচ্চ অবয়ব থাকায় গলায় অথবা বাহুতে ধারণ করা খুব অসুবিধাজনক মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষুদ্র তাম্র-ফলকগুলি সম্ভবতঃ পবিত্র দ্রব্য কিংবা রক্ষাকবচরূপে অঙ্গে ধারণ করা হইত। ঐগুলিতে কোন ছিদ্র কিংবা কড়া দেখিতে পাওয়া যায় না। কাপড় কিংবা অন্য কোন দ্রব্যের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ঐগুলিকে ধারণ করা হইত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

শীলমোহরের দুই প্রকার ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ আধুনিক যুগের অর্থনীতির দৃষ্টিতে মনে হয় ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রব্যের উপর ছাপ দেওয়ার নিমিত্ত প্রচলিত ছিল, কিংবা ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং আধিদৈবিক কার্য্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান যুগেও আমরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধি প্রভৃতির জন্য শীলমোহর-জাতীয় জিনিসের ব্যবহার দেখিতে পাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কোন কোন সম্প্রদায় এইরূপ দ্রব্য ধারণ ও পূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখনও পিতলের ছাপে রাধা, কৃষ্ণ অথবা যুগলমূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া ঐ মূর্ত্তির পাদদেশে অথবা পার্শ্বে কিংবা মূর্ত্তি ব্যতীতই "শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ" প্রভৃতি লেখাইয়া ইহা দ্বারা পবিত্র মৃত্তিকার ছাপ বক্ষ, বাহু ও কপাল প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদের ছাপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত এইসব পিতলের দ্রব্যকে 'ছাপ' বলা হইয়া থাকে।

অনেকে এই ছাপকে বিগ্রহের সমান আসনে স্থান দিয়া পূজা করেন। আবার ধাতুদ্রব্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া কেহ কেহ গলায় কিংবা বাহুতে ধারণ করিয়া থাকেন।

এইসব দ্রব্য মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহর-ব্যবহার-প্রণালীর কোন স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে কিনা ঠিক বলিতে পারা যায় না ; কারণ অঙ্গে ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইলে অবতল (concave) শীলমোহরের ভিতরের সূক্ষ্ম রেখাগুলির চিহ্ন ছাপে মোটেই দেখা যাইবে না। কাজেই এই কার্য্যের জন্য ঐগুলির ব্যবহার যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে তাম্র-প্রস্তর যুগের সিন্ধু্পত্যকার শীলমোহর এবং তাম্র ও ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত অক্ষরযুক্ত ফলকগুলির অন্য কারণে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া সার্থকতা থাকিতে পারে। ঐগুলি হয়ত গৃহের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইত এবং পূজার আসনেও স্থান পাইয়া থাকিত।

শীলমোহরে অঙ্কিত জীবজন্তুগুলি বিশেষ বিশেষ দেবতার বাহন বলিয়া মনে করাও যাইতে পারে। হিন্দুরা সময় সময় স্বীয় অভীষ্ট দেবতার বাহনের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তক্ষশিলাবাসী গ্রীক্দূত দিও-পুত্র হেলিওদোরোস্ (Heliodoros, 2nd. Cen. B.C.)-প্রতিষ্ঠিত বিদিশার গরুড়ধ্বজ, এবং কাশীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণের নন্দী এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করে।

ভারতের আধুনিক হিন্দু সমাজে মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে অঙ্কিত জীবজন্তু সমূহের কোন কোনটীর বাহনত্বের প্রমাণ সাহিত্য কিংবা জনশ্রুতিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহারা যে এই কার্য্যের জন্য কল্পিত হইত না তাহা কে বলিতে পারে? যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে দেখা যাইবে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ও বাহন ছিল। এই ভাবে মোহেন্-জো-দড়োর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরও একটা সংখ্যা পাওয়া যাইতে পারে।

শীলমোহরাঙ্কিত জীবজন্তু জাতি- বা সম্প্রদায়-বিশেষের টোটেম্ (totem) ছিল বলিয়া কল্পনা করা কি অসম্ভব হইবে? ভারতের দ্রাবিড়ীয় কিংবা অন্য কোন কোন অনার্য্য জাতির মধ্যে এখনও টোটেমের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সিন্ধুপত্যকাবাসীদের মত একটী বিশিষ্ট সভ্য জাতির অর্থ-সমস্যার জটিলতা দূর করিবার জন্য কি কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না? এই প্রশ্নের এখনও কোন সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই। তবে ঐ যুগে বিনিময় প্রথা হয়ত ছিল। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চতুষ্কোণ পাতলা তাম্র ও ব্রোঞ্জ্-নির্ম্মিত ফলক ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের একদিকে পশুচিহ্ন এবং অন্যদিকে চিত্রাক্ষর অঙ্কিত আছে। কেহ কেহ এই ফলকগুলিকেই সিন্ধুপত্যকাবাসীদের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন।[১] আবার মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত চিত্রাক্ষর-যুক্ত তামার প্রায়-চক্রাকার একটী পুরাবস্তু ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের প্রদর্শনী-গৃহে রক্ষিত আছে। ইহা দেখিয়া মুদ্রা বলিয়াই ধারণা হয়।[২]

মোহেন্-জো-দড়ো-সভ্যতার বহুকাল পরে প্রাচীন ভারতে যুগে যুগে চক্রাকার ও চতুষ্কোণ তাম্র- কিংবা অন্য ধাতু-

[১] Hunter, "Scripts of Mohenjodaro and Harappa," p. 26.

[২] ইহা মুদ্রা হইলে এরূপ জিনিষ আরও পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হওয়ায় ইহা সত্যই মুদ্রা কিনা সন্দেহ হয়। প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক রাজা ও রাজবংশের মুদ্রা মোটেই পাওয়া যায় নাই, কিংবা পাইলেও অল্প সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে; এজন্য তাহাদের মুদ্রা প্রচলিত ছিল না বলিয়া অনুমান করা যায় না।

নির্ম্মিত মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া যথেষ্ট প্রমা পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর তাম্রফলক-সমূহ ও ইণ্ডিয়া মিউজিয়মে রক্ষিত চক্রাকার দ্রব্যটী যদি সত্য সত্য মুদ্রা বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে এইসকল উপাদানের বলে ঐগুলিকে ভারতীয় মুদ্রার অগ্রদূত বলিয়া ধরিয়া লওয় যাইতে পারে। মোহেন্-জো-দড়োতে রাখালবাবুর খননে ফলে অন্যান্য পুরাবস্তুর সঙ্গে চিত্রাক্ষরযুক্ত দীর্ঘাকার তামা চারিটী পুরু মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ১৯২২-২৩ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে উল্লেখ আছে।[১] রাখাল-বাবু বোধ হয় ক্ষুদ্র ফলকগুলিকে মুদ্রা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এখানে লব্ধ তাম্র বা ব্রোঞ্জ্ ফলকের মত দ্রব্য পৃথিবীর আর কোন প্রচীন নগরীতে ঐ যুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া এ যাবৎ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

শীলমোহর পাঠের উদ্যম—

স্যর্ আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম্

সিন্ধুপত্যকার শীলমোহরের লেখা পড়িবার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ১৮৭২-৭৩ অব্দে স্যর্ আলেকজাণ্ডার্ কানিংহাম্ তদীয় রিপোর্টে[২] উল্লেখ করিয়াছেন যে মেজর ক্লার্ক (Major Clark) নামক জনৈক ইউরোপীয় ব্যক্তি হরপ্পা নামক স্থানে ককুদ্-বিহীন (humpless) বৃষ ও ছয়টী

[১] "Four thick oblong Copper Coins inscribed with pictograms were discovered at this level." Arch. Sur. Rep, 1922-23, p. 103.

[২] Cunnigham, Archæological Report, Vol. V. p. 168 (published in 1875 A. D.).

অজ্ঞাত-অক্ষর যুক্ত কাল পাথরের একটী আশ্চার্য্য শীলমোহর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কানিংহাম্ বলেন যে এই অক্ষর ভারতীয় নয় এবং যেহেতু ক্ষোদিত বৃষটী ককুদ্‌বান্ নয় সুতরাং শীলমোহরও বিদেশীয়ই হইবে।

তিনিই আবার কিছুদিন পরে স্বপ্রণীত গ্রন্থান্তরে[১] বলিয়াছেন যে উল্লিখিত শীলমোহরটী খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হইবে, অধিকন্তু পূর্ব্বের উক্তির সংশোধন করিয়া বলেন যে ইহার লেখা ভারতীয় আদি লিপির নমুনা এবং বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক যুগের।

শীলমোহরের সময়-নির্ণয়-বিষয়ে তাঁহার উক্তি নির্ভুল না হইলেও তিনিই সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে ইহার কোন কোন অক্ষরের সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করিয়া ঐ ছয়টী অক্ষরে "লছমিয়" শব্দটী লেখা আছে বলিয়া একটী পাঠ উপস্থাপিত করেন। কানিংহামের প্রতিভা অসাধারণ ছিল, যদিও ব্রাহ্মীর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ-স্থাপনের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এই অনুমানের একটা মৌলিকত্ব আছে এবং একদিন এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়াও অসম্ভব নয়; কারণ প্রফেসর ল্যাঙ্গ্‌ডনের মত মনীষী ব্যক্তিও এখন মোহেন্-জো-দড়ো লিপিই ব্রাহ্মী লিপির আদি জননী বলিয়া অনুমান করেন।

ডাঃ ফ্লিট্

কানিংহামের বহু বৎসর পরে ডাঃ ফ্লিট্ (Dr. Fleet) কানিংহাম-প্রকাশিত শীলমোহর ব্যতীত আরও দুইটীর

[১] Corp. Ins. Ind., Vol. I, pp. 61-62 (published in 1877. A. D).

ছবি প্রকাশিত করেন।[১] এইগুলিও হরপ্পা নগর হইতেই প্রাপ্ত। ফ্লিট্‌-প্রকাশিত এখানকার 'B' চিহ্নিত শীলমোহর বহু বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান আন্টিকুয়ারী পত্রিকায়[২] উল্টাভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'C' চিহ্নিত শীলমোহরখানা মিঃ ডেমস্‌ নামক জনৈক ভদ্রলোক তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বপ্রথম এখানেই প্রকাশিত হয়। কানিংহামের নির্দ্দেশ অনুসারে ফ্লিট্‌ও ইহা হইতে "ক-লো-মো-লো-গূ-ত" (Ka-lo-mo-lo-gü-ta) নামক শব্দের পাঠ উপস্থাপিত করেন। এই পাঠের সত্যাসত্য নির্ণয় কেহই এ যাবৎ করিতে পারে নাই। কবে হইবে তাহারও ঠিক নাই।

জয়স্‌বাল

অতঃপর, শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্‌বাল পূর্ব্বোক্ত 'B' চিহ্নিত শীলমোহরের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন।[৩] তিনিও স্যর্‌ আলেকজাণ্ডার কানিংহামের উক্তির সমর্থন করিয়া বলেন, এই লেখা পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রলিপি অপেক্ষা পুরাতন-ব্রাহ্মী লিপিরই অধিকতর সমীপবর্ত্তী। তিনি এই শীলমোহরের লিপি বাম দিক্‌ হইতে "লো-বো-ব্য-দী" (lo-bo-bya-dī) পড়িলেন; কিন্তু ইহার ছাপের স্বাভাবিক পাঠ (অর্থাৎ শীলমোহরটীর লিপির পাঠ ডান দিক্‌ হইতে পড়িলে) 'দীব্য-বলো' বলিয়া মনে করেন। 'C' চিহ্নিত শীলমোহরটী তিনি এইরূপ ভাবে "ত-পূ-লো-মো-গো" (= ত্রিপুর ময়ূরক ?) বলিয়া পড়িতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার পাঠের

[১] J. R. A. S. for 1912, pp. 699 ff.

[২] Indian Antiquary, Vol. XV (1886), p. 1.

[৩] Ind. Ant., 1913, p. 203.

সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না। কারণ, ইহা নিশ্চিতভাবে ঠিক হইয়া গিয়াছে যে মোহেন্-জো-দড়োর লেখার গতি দক্ষিণ হইতে বামে। শীলমোহরের লেখা উল্টা থাকে, কাজেই উহা বাঁ হইতে ডাইনে পড়া উচিত। শ্রীযুক্ত জয়স্‌বাল বাম হইতে পড়িয়া পুনরায় বিপরীত পাঠ গ্রহণের জন্য পাঠভ্রম হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। জয়স্‌বালের এই প্রচেষ্টার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল। ইহা লইয়া মনীষি-সমাজে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। অতঃপর মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত শত শত শীলমোহর প্রাপ্ত হওয়ায় পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি এ দিকে পুনরায় নূতনভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। মিসরীয়, এসিরীয় এবং সুমেরীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত সেইস্ (Sayce), গ্যাড্ (C. F. Gadd) সিড্‌নি স্মিথ্ (Sidney Smith), ল্যাঙ্গ্‌ডন্ (S. Langdon) ও স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি (Sir Flinders Petrie) প্রভৃতি মনীষীর দৃষ্টি প্রাগৈতিহাসিক ভারতের লিপিমালার দিকে আকৃষ্ট হয়।

গ্যাড্—

গ্যাড্ বলেন, তিনি এই লিপিমালার এক বর্ণও পড়িতে পারেন নাই, তবে নানা দেশের প্রাচীন ভাষায় অভিজ্ঞতার ফলে তিনি কতকগুলি অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন, এবং ইহার পাঠোদ্ধারের জন্য মেসোপটেমিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছেন। এই অক্ষরমালা চিত্রাত্মক, এবং ইহাতে নানা ভঙ্গীর মানুষ, বিভিন্ন চিহ্ন-যুক্ত মৎস্য, পর্ব্বত, হস্ত, পদ, বর্শা, ছত্র, পথ ও বৃক্ষ প্রভৃতি চিহ্ন তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই লিপিমালার পঠন-প্রণালী ডান দিক্ হইতে বাম দিকে, এই অনুমানেরও তিনি অবতারণা করিয়াছেন।

সিন্ধু-উপত্যকার লিপি একস্বরসূচিত অক্ষর-মালার (syllable) সমষ্টি, এবং স্বতন্ত্র ধ্বনিযুক্ত বর্ণমালার সৃষ্টি তখনও হয় নাই বলিয়া তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। লেখগুলিতে ব্যক্তিবিশেষের নাম ও উপাধি এবং ঐ নামগুলি ইন্দো-আর্য্য (Indo-Aryan) ভাষার অন্তর্গত বলিয়া তিনি অনুমান করেন। একটী শীলমোহরে তিনি "পুত্র" ( ) এই শব্দটীর পাঠোদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে এই অনুমানের বিরুদ্ধে বহু কথাই বলিবার থাকিবে বলিয়া তিনি নিজেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত লাঞ্ছনময় (punch-marked) মুদ্রার কোন কোন চিহ্নের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের চিহ্নের আশ্চার্য্যরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি প্রথম স্থির করিয়াছেন।[১]

সিড্‌নি স্মিথ্—

সিড্‌নি স্মিথ্‌ও এই অজ্ঞাত বিষয়ে বিশেষ কোন আলোকপাত করিতে পারেন নাই। শীলমোহর-সমূহে বিভিন্ন শব্দ ও ব্যক্তিগত নাম থাকিতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। গ্যাডের অনুমানের বিরুদ্ধে ঊর্দ্ধদিকে লম্বা রেখাগুলিকে (|||) সংখ্যার অক্ষর-দ্যোতকের পরিবর্ত্তে সংখ্যাবোধক বলিয়া তিনি মনে করেন।[২] সুমেরীয় লেখার

[১] M. I. C., Vol. II, p. 413.

[২] *Ibid*, p. 418.

সঙ্গে সাদৃশ্য ব্যতীত তিনি আফ্রিকা ও আরব দেশের কোন কোন জাতির (tribe) অক্ষরের সঙ্গেও এই লিপির সাদৃশ্য দেখিতে পান। এইরূপ কোন কোন চিহ্ন লিবীয় মরুর (Libyan desert) সেলিমা (Selima) নামক স্থানেও দেখা যায়। কাহারো কাহারো মতে এইরূপ সাদৃশ্য আকস্মিক বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি চিহ্ন ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা-জনক বোধে নানা জাতির মধ্যেই লোকপরম্পরায় কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রচলিত হইত বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

ল্যাঙ্গ্‌ডন্‌—

ল্যাঙ্গ্‌ডন্‌ মোহেন্‌-জো-দড়োর চিত্রাক্ষর হইতে ব্রাহ্মী বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন; এবং ব্রাহ্মী লিপির কতিপয় বর্ণের মূল সিন্ধুলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উভয় লিপির সমান আকৃতি-বিশিষ্ট চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি যদিও উভয়ের উচ্চারণ-সাম্যের বিষয়েরও অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেই আশা করেন না। ব্রাহ্মী লিপির অক্ষর সমান কিংবা প্রায়-সমান আকৃতি-বিশিষ্ট সিন্ধুলিপির অক্ষরের ধ্বনিও সূচনা করে কিনা এই বিষয়ে তিনি নিজেই সন্দিহান। ব্রাহ্মী বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরে (syllable) যেমন ব্যঞ্জনের পর স্বরবর্ণের ধ্বনি শ্রুত হয় (যথা, ক্‌+অ=ক, খ্‌+অ=খ ইত্যাদি) সিন্ধুলিপিতে সেরূপ বিধান ছিল কিনা সে বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত

হইতে পারেন নাই ; বরং এইরূপ পরিণতির বিষয়ে সন্দেহই প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, সুমেরীয় বা আদি-এলামীয় লিপির সঙ্গে সিন্ধুলিপির প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষ-ভাবে কোন সম্পর্ক নাই। সুমেরীয় রেখাক্ষর (linear) কিংবা কীলকাক্ষর (Cuneiform) অপেক্ষা মিসরের চিত্রাক্ষরের (hieroglyphs) সঙ্গে সিন্ধুলিপির অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

তিনি সিন্ধু-লেখ-র চিহ্নগুলি শব্দাংশ (syllable)-জ্ঞাপক এবং লেখা ধ্বনি-দ্যোতক (phonetic) মনে করেন। কোন কোন চিহ্ন আবার শুধু জ্ঞাপক হিসাবেই শব্দের আদিতে বা অন্তে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ইহারা সম্ভবতঃ উচ্চারিত হইত না। সিন্ধুলিপির বহু চিহ্নের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি ব্রাহ্মী বর্ণমালার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।[২]

তিনি সিন্ধুলিপির যে সব চিহ্নের আকৃতি ও ধ্বনি প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাদের সাহায্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে তাঁহারা যদি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বীর এবং যোদ্ধাদের নাম বাহির করিয়া শীলমোহরের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখেন তবে এই লিপির পাঠোদ্ধার-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কিনা দেখা যাইতে পারে।[৩]

[১] M. I. C., Vol. II, pp. 423-24.

[২] *Ibid*, p. 423.

[৩] *Ibid*, p. 431.

ওয়াডেল্—

শ্রীযুক্ত এল্. এ. ওয়াডেল (L. A. Wadell) তাঁহার পুস্তকে ("Indo-Sumerian Seals Deciphered") মোহেন্-জো-দড়োর অক্ষর পড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন শীলমোহরের ভাষা সংস্কৃত এবং তাহাতে ভৃগু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দ তিনি পড়িয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন; কিন্তু এ যাবৎ তাঁহার মত পণ্ডিত-সমাজে গ্রাহ্য হয় নাই।

প্রাণনাথ—

ডাঃ প্রাণনাথ প্রফেসার ল্যাঙ্গ্ডনের নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মী ও আদি-এলামীয় (Proto-Elamite) বা আদি-ইরানীয় লেখার সাহায্যে বহুসংখ্যক শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি ঐ লেখায় শু-নিন্-সিন নাম পড়িয়া ইহাকে সুমেরীয় নিসিন্ন (Nisinna) এবং ভারতীয় নিচীন (Nicina) দেবের নামের সমান বলিতে চাহেন। এইরূপভাবে তিনি ভারতীয় সিনীবালীকে সিনি-ইসর, নগেশকে ইসল্-নগেন প্রভৃতি শব্দের পাঠোদ্ধার করিয়া মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১] কিন্তু তাঁহার এইরূপ পরিশ্রমেও পণ্ডিত-মণ্ডলী সন্তুষ্ট হন নাই এবং ইহার যে যথাযথ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহা এখনও কেহই মনে করেন না।

[১] Indian Historical Quarterly, Vol. VII, No. 4, 1931, & ol. VIII, No. 2, 1932.

মেরিজ্জি—

ফন্ পি. মেরিজ্জি (Von P. Meriggi) কিছুদিন পূর্ব্বে সিন্ধু-পত্যকার শীলমোহরের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিপিপাঠের পক্ষে কোন নূতন আলোকপাত করিতে পারেন নাই।[১]

ডাঃ জি. আর. হাণ্টার—

ডাঃ জি. আর. হাণ্টার-ও বহুদিন যাবৎ এই লিপি লইয়া যথেষ্ট গবেষণা করিতেছেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে[২] তাঁহার অদম্য চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শৃঙ্খলা-সহকারে নানাভাবে লিপিগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মিসর ও সুমের প্রভৃতি স্থানের অক্ষরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলেও আদি-এলামবাসীর (Proto-Elamite) লেখার সঙ্গেই মোহেন-জো-দড়োর অক্ষরের সাদৃশ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্ট হয় বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহার মতে ঐ চিহ্নগুলি কোন বর্ণমালার (alphabet) অন্তর্ভুক্ত নয়, ইহারা সুমেরীয় লেখার মত ধ্বনি (phonetic) এবং চিত্র-যুক্ত (pictographic) চিহ্নসমূহের সংমিশ্রণমাত্র। এ স্থানের ভাষা আর্য্য কিংবা শেমীয় জাতির ভাষার অন্তর্গত বলিয়া তিনি মনে করেন না; কারণ, তাঁহার ধারণা, এই সিন্ধুলিপির ভাষা একাক্ষরাত্মক (mono-syllabic)। আদি-এলাম-বাসীর

[১] Z. D. M. G., 1934., pp. 198 f.

[২] G. R. Hunter, 'The Script of Harappa and Mohenjodaro,' & J. R. A. S., 1932.

(Proto-Elamite) ফলকাঙ্কিত ভাষার সঙ্গেও ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু উভয় স্থানের কতকগুলি চিহ্ন সমান এবং ঐগুলি ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া তিনি মনে করেন। এখানে আবিষ্কৃত এই অজ্ঞাতলিপি- ও নানারূপ পশুর আকৃতি-যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্র বা ব্রোঞ্জ-ফলকগুলিকে তিনি ঐ যুগে প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। ডাঃ হাণ্টার আরও বলেন যে তিনি সম্প্রদান ও অপাদান কারকের এবং সংখ্যার চিহ্ন ও ভৃত্য (servant), দাস (slave), ও পুত্র (son) -বাচক শব্দ পড়িতে পারিয়াছেন। কিন্তু যত দিন না সিন্ধুতীর কিংবা মেসোপটেমিয়া অথবা অন্যত্র কোন দ্বিভাষিক (bilingual) শীলমোহর বা লেখ আবিষ্কৃত হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণার মধ্যে প্রকৃত সত্য নিহিত থাকিলেও সেই পাঠ কেহ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবে না।

ডাঃ সি. এল. ফাব্রি (Dr. C. L. Fabri)—

ডাঃ সি. এল. ফাব্রি-ও মোহেন্-জো-দড়ো-শীলমোহর-সম্বন্ধে কোন কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।[১] কিন্তু তিনিও লিপি-সমস্যার উপর বিশেষ কোন নূতন আলোকপাত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রবন্ধেও অন্য কর্তৃক পূর্ব্বে আলোচিত কথারই বিশদভাবে পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় লাঞ্ছনময় (punch-marked) মুদ্রার চিত্রের সঙ্গে সিন্ধুপত্যকার শীল-

[১] Indian Culture, Vol. I, 1934-35, pp. 51-56.

মোহরের চিত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন[১] সে কথা তাঁহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গ্যাড্-ই বলিয়াছেন।[২] তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধেও বিশেষ কোন নূতন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই শুনা গিয়াছিল যে তিনি নাকি সৈন্ধবলিপি পাঠোদ্ধারের প্রায় সমীপবর্ত্তী। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিনি সে বিষয়ে কোন নূতন তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি—

প্রাচীন মিসরীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত প্রবীণ মনীষী স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি (Sir Flinders Petrie)[৩] স্বীয় সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার বলে পুরাতন মিসরের লেখার সঙ্গে স্থানে স্থানে মোহেন্-জো-দড়োর লেখার সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করিয়া বলেন যে এখানকার শীলমোহরের শতকরা প্রায় ৫০টীই রাজকীয় কর্ম্মচারীর জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহাদের মধ্যে মিসরীয় শীলমোহরের ধরণে পথাধ্যক্ষ, পদাতি-পঞ্চাধিকরণ-শকটাধ্যক্ষ (Wakil of the Wagon of official of the court of five for infantry), রাজকীয় জালিকাধ্যক্ষ (Wakil of the official trapper), বৃহৎ চক্রযানাধ্যক্ষ, ধনুর্দ্ধরাধিকরণ (office of archers), খাত ও সেচ-বিভাগের কর্ত্তা (official of canal and water supply), ধনুর্দ্ধর, অরণ্যাধিপতি,

১ J. R. A. S., 1935, pp. 307-18.

২ M. I. C., Vol. II., p. 413.

৩ Petrie, "Ancient Egypt and the East," 1932, pp. 33-40. Statesman, 14th Sept., 1932.

রাজকীয় ব্যাধাধ্যক্ষ (Wakil of official hunters) ইত্যাদি রাজকীয় কর্ম্মচারিসংক্রান্ত বিষয়ে শীলমোহরের উপযোগিতার প্রতি তিনি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শীলমোহরগুলি উল্লিখিতভাবে ভাবব্যঞ্জক ধরিয়া লইয়া তিনি বলেন, মিসর, সুমের ও চীনের ভাবব্যঞ্জক চিত্রাক্ষরের মত মোহেন্-জো-দড়োর লেখাও ভাবব্যঞ্জক ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

তিনি মনে করেন, অরণ্য, খাত, সেচ, বাণিজ্য, চক্রযান এবং বাণিজ্যে ও রাজকীয় কর্ম্মব্যপদেশে ব্যবহৃত আবাস প্রভৃতি ভারতের চিরন্তন জিনিস। ভারতীয় উন্নত নাগরিক জীবনের আদর্শ—ইহারা আমাদের চক্ষুর সমীপে চিত্রপটের ন্যায় ধরিয়া দেয়। উক্ত স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ পেটি, স্যর্ জন্ মার্শাল্ সম্পাদিত মোহেন-জো-দড়ো ও সিন্ধুসভ্যতা (Mohen-jo-daro and the Indus Civilisation) নামক পুস্তকের ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত প্রথম্ ১০০টী শীলমোহরের মধ্যে তাঁহার বর্ণিত ৩৫টীতে রাজকীয় কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পান। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ইহাতে নাই বলিয়া তাঁহার মত, কারণ প্রাচীন মিসরের লেখায়ও প্রথমাবস্থায় এইরূপ বিভাগীয় উপাধিই থাকিত, ব্যক্তিবিশেষের নাম থাকিত না। পঞ্চম বংশের (5th Dynasty) পর মিসরে জনসাধারণের জন্য রাজার নামের শীলমোহর ব্যবহৃত হইত। তত্রত্য শীলমোহরে সেই সময় পর্য্যন্ত বয়ন ও গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, এই সব তখনও রাজকীয় তত্ত্বাবধানে আসে নাই। মোহেন-জো-দড়োর শীলমোহরে চক্র-চিহ্নের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; পণ্যদ্রব্য ও রসদাদি আদান-প্রদানের

জন্য সম্ভবতঃ ঐ সব শীলমোহরের ব্যবহার হইত বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

প্রথম শীল-শতকের মধ্যে পদাতি সৈনিকের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আবাস-ব্যবস্থাপক বিভাগীয় চক্রযান পরিদর্শক, খাদ্য-বিভাগীয় রাজদূত এবং তৃতীয় শ্রেণীর আবাসের জলবিভাগের অধ্যক্ষ রাজপুরুষ (knight over hostel of third grade and water works) প্রভৃতির শীলমোহর আছে বলিয়া স্যর্ ফ্লিণ্ডার্স্ মত প্রকাশ করেন। তাঁহার অনুমান সত্য হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তখনও আধুনিক যুগের মত নানা বিভাগ নানারূপ কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসিত হইত। বিভিন্ন জাতীয় শীলমোহর দেখিলে মনে হয়, তখন শাসন-বিভাগ (Administration) ও কার্য্যকরী (Executive) বিভাগ উভয়ই বর্ত্তমান ছিল। বন-বিভাগ, সৈন্য-বিভাগ এবং জনহিতকর কার্য্যেরও পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ বর্ত্তমান ছিল। সেচ-বিভাগ, বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানীর বিভাগ ও ইহার পরিদর্শক, রাজকীয় মৃগয়া-বিভাগ এবং সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রভৃতিও বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি মনে করেন।

হেভেশি—

শ্রীযুক্ত হেভেশি (M. G. de Hevesy) প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত পোলিনেশিয়ার অন্তর্গত ইষ্টার আয়্‌ল্যাণ্ডের কাষ্ঠ-ক্ষোদিত অধুনা বিলুপ্ত লিপির সঙ্গে মোহেন্‌-জো-দড়োর শতাধিক লিপির সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। এই উভয় লিপির আকৃতির মধ্যে কতকগুলি অক্ষরের এত ঘনিষ্ঠ

মিল দেখা যায় যে সেরূপ অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। হেভেশি ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই।[১]

বিক্রমখোল লেখ—

কিছুদিন পূর্ব্বে সম্বলপুর জেলার বিক্রমখোল নামক স্থানে, পর্ব্বত-গাত্রে এক শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল মনে করেন, এই অক্ষর সিন্ধুলিপি ও ব্রাহ্মী লিপির মধ্য অবস্থার পরিচায়ক। এই বিষয়ে তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্ আন্টিকুয়ারী (Indian Antiquary) পত্রিকায়[২] তিনি যে ফটোগ্রাফ ও লিপি-বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহাতে অতি সামান্য সংখ্যক লিপিতে সিন্ধুলিপির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে যে এই সমস্যার সমাধান হইবে সেরূপ আশা পোষণ করা যায় না।

এইরূপ দুই চারিটী চিহ্ন রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের নিম্ন-শ্রেণীর অধিবাসীদের গায়ের উল্কির (tattoo) সঙ্গেও মিলিয়া যায়। এই উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইহা-দ্বারা লিপি-সমস্যা-সমাধানের কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব।

রেভারেণ্ড্ হেরাস্—

(Rev. Fr. H. Heras, S. J.) রেভারেণ্ড্ হেরাস্

১ Bulletin de la Société Prehistorique Francaise, 1933, Nos. 7-8. Sur une E'criture Océénienne.

২ Indian Aniquary, Vol. LXII., 1933, pp. 58-63.

গত ২৮শে জুলাই তারিখে (১৯৩৬ সাল) রয়েল্‌ এসিয়াটিক্‌ সোসাইটীর বোম্বাই শাখার (Bombay Branch of the Royal Asiatic Society) এক অধিবেশনে "শীলমোহরের লেখা হইতে মোহেন্‌-জো-দড়োবাসীদের ধর্ম্ম"-সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলেন যে তিনি ঐ লেখা-সমূহ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এখানে সকল দেবগণের উপরস্থ প্রধান উপাস্য দেবতাকে "অন্‌" (An) বলা হইত। তিনি বলেন, লেখ-সমূহে "অন্‌"কে জীবন (life), একত্ব (oneness), মহত্ত্ব (greatness), পালন (protection), সর্ব্বজ্ঞত্ব, (omniscience), ঔদার্য্য (benevolence), সংহার (destruction) ও সৃষ্টির (generation) কর্ত্তা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ দেবতার আট প্রকার বিভূতি ছিল। ইঁহাদের মধ্যে "অন্‌"ই সর্ব্ব প্রধান। ইঁহাকে সূর্য্য বলিয়াও কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ যুগে আটটী রাশি ছিল; এই কথা মোহেন্‌-জো-দড়ো-লেখে এবং প্রবাদ-বাক্যেও নাকি আছে। এক "অন্‌"ই বৎসরের বিভিন্ন আটটী মাসে আট প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিতেন। শীলমোহরে মেষ (ram) ও মীন (fish) রাশির কথা নাকি বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। মেষ ও মীন রাশির সম্মিলিত আকৃতি একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাকে নন্দুর (Nandur)-এর ঈশ্বর (God of Nandur) বলা হইয়াছে। নন্দুর অর্থে নাকি কর্কটের দেশ বুঝায়, এবং মোহেন্‌-জো-দড়োর নাম "নন্দুর" ছিল বলিয়া তিনি (হেরাস্‌) মনে করেন।

তিনি বলেন, এখানকার লেখায় ত্রিনেত্রযুক্ত দেবের পূজা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত এনমৈ

(Enmai), বিডুকন্ (Bidukan), পেরন্ (Peran) ও তণ্ডকন্ (Tandakan) প্রভৃতি শিবের নাম নাকি ঐ যুগে "অন্"-এরই নাম ছিল।

তিনি আরও বলেন লিঙ্গপূজা এখানে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল না। মোহেন্-জো-দড়োর অধিকাংশ লোক "মে-ই-ন" (Meina) (সংস্কৃত সাহিত্যের মৎস্য) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহারা লিঙ্গপূজায় অবহেলা প্রদর্শন করিত। বিল্লব (Billavas) ও কবল্ (Kavals) নামক জাতির নিকট হইতে মোহেন্-জো-দড়োর চুন্নি মীন (Chunni Mina) নামক রাজা সেখানে লিঙ্গপূজা প্রচার করেন, কিন্তু এই প্রচার-কর্ম্মের জন্য তিনি লোকের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন। ফলে তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া বলি দিয়াছিল বলিয়া লেখায় নাকি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ত্রীদেবতার পূজাও প্রচলিত ছিল। এখানে তিনটী প্রধান দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি (হেরাস্) বলেন। ইঁহাদের মধ্যে অম্মা (Amma) বা মাতৃকা দেবীর স্থান দ্বিতীয়।

বৃক্ষের পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াও নাকি তিনি লেখায় প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রতি নগর ও পল্লীতে পবিত্র বৃক্ষ থাকিত। ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথারও উল্লেখ আছে। ত্রিশূলের উল্লেখও নাকি তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। নরবলি হইত বলিয়াও তিনি মনে করেন। সাতটী কিংবা সাতের গুণক (যথা একুশ প্রভৃতি)-সংখ্যক নরবলির প্রথা ছিল। বৃক্ষের অধোদেশে বলি হইত। যে বৃক্ষের নীচে বলি হইত তাহাকে "মরণ-বৃক্ষ" (Death-tree) বলা হইত। মৃতদেহ গরুর গাড়ীতে করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া দাহ করা হইত। বেশীর ভাগ

সম্পত্তিই মন্দিরের দেবতার পূজার জন্য দেবোত্তর থাকিত। এক সময়ে নাকি মৎস্য-কর (fish-tax) পর্য্যন্ত লিঙ্গপূজায় ব্যয়িত হইত। ইহা ভগবানেরই রাজ্য এবং তাঁহারই প্রতিনিধি—এই ধারণা লইয়া একাধারে ধর্ম্ম ও রাজ্য এই উভয়ের উপর রাজারা কর্ত্তৃত্ব করিতেন।[১]

উল্লিখিত সমস্ত কথাই হেরাস্ বলিয়াছেন। তিনি কিরূপ ভাবে যে শীলমোহর পাঠ করিয়া এত তথ্য আবিষ্কার করিলেন—তিনিই জানেন। তাঁহার পাঠগুলি কষ্টি-পাথর দিয়া পরীক্ষা করিলে তাহা এই পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে সে কথা বলা শক্ত। তাঁহার পাঠ-প্রণালীর কোন সূত্রই বক্তৃতার রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেগুলি প্রকাশিত হইলে পরখ করিয়া না দেখিয়া তাঁহার কৃতিত্ব-সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি যে এত কথা বলিলেন, ইহা কি নিছক অনুমান না প্রকৃত তথ্য, এবিষয় পণ্ডিতদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করা এখন পর্য্যন্ত আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই; যাঁহারা পাঠোদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতগুলিও পণ্ডিত-সমাজে এখনও গ্রাহ্য হয় নাই। তবে অন্য দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়, সিন্ধু-সভ্যতার পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে এই শীলমোহরের প্রভাব নানাভাবে যে অনুভূত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এখানকার শীলমোহরের অনেক চিত্র প্রাচীন ভারতের 'লাঞ্ছনময়' (punch-marked) মুদ্রায়ও

১ Advance, 2nd. Aug., 1936, Cal. Ed.

দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রথম গ্যাড্ এবং তৎপরে ফাব্রি এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ব্যাক্টীয় (Bactrian) ও ইন্দো-গ্রীক্ (Indo-Greek) রাজাদের অনেক মুদ্রায় বৃষ ও গজ-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইন্দো-পার্থীয় (Indo-Parthian) নৃপতিদের মুদ্রায়ও গজ ও বৃষ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালের রাজাদের মুদ্রাতেও এইরূপ প্রভাব বিস্তার-লাভ করিয়াছিল।[১] গুপ্ত-যুগের (Gupta period) অনেক মুদ্রায়ও বৃষ বা নন্দীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] অন্ধ্রবংশীয় (Andhra Dynasty) রাজাদের মুদ্রায়ও মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে ব্যবহৃত তীর-ধনুক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।[৩]

ঐতিহাসিক যুগের তাম্র-ফলকে প্রশস্তি বা দান-পত্রাদি লিখিবার যে প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলে সিন্ধু-সভ্যতার ক্ষুদ্র তাম্র-ফলকের প্রভাব আছে কিনা ভাবিবার বিষয়। পরবর্ত্তী যুগের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ[৪] ও সপ্তম[৫] শতাব্দীর

[১] V. A. Smith, Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, দ্রষ্টব্য।

[২] Silver Coins of Skanda Gupta, Nos. 445-50; Allan's Catalogue, pp. 121-22, also on the obverse of two unattributed (or Srī Vīrasena's 2) gold Coins, Nos. 615, 616; Allan's Catalogue, pp. 151-52. প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগের উজ্জয়িনী মুদ্রায়ও যে বৃষের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

[৩] E. J. Rapson, Catalogue of Indian Conis, Andhras, W. Ksatrapas, etc. দ্রষ্টব্য।

[৪] Ep. Ind., Vol. III, No. 46.

[৫] *Ibid*, Vol. I, No. 18.

বলভীরাজ-বংশের কোন কোন তাম্র-ফলকের এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর [১] কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের সময়ের তাম্র-ফলকের শীলমোহরে বৃষের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিলে ঐতিহাসিক যুগের আরও অনেক রাজার শীলমোহরে মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরের প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে।

---

১ *Ibid*, Vol. VI, No. 14.

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভাষা

ইতিপূর্ব্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে মোটামুটি দেখা গিয়াছে যে আহার-বিহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিল্প-বাণিজ্য ও জীবন-যাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রে সিন্ধুপত্যকাবাসী ও বৈদিক আর্য্যদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল, সুতরাং ভারতীয় আর্য্যদিগকে মোহেন্-জো-দড়ো-সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে এত প্রাচীন কালে তাঁহারা যে এ দেশে ছিলেন তাহারও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কাজেই মোহেন-জো-দড়োর শীলমোহরের ভাষা খুব সম্ভব আর্য্যভাষা (সংস্কৃত) নয়। সিন্ধুপত্যকায় তখন দ্রাবিড় জাতির (Dravidians) বাস ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কারণ সিন্ধুপ্রদেশ-সংলগ্ন বেলুচিস্থানের ব্রাহুই (Brahui) জাতির ভাষা বর্ত্তমান দক্ষিণভারত-নিবাসী দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। ব্রাহুইরাই নাকি বেলুচিস্থানের প্রাচীনতম অধিবাসী, আর্য্যভাষী ইরানী বেলুচিরা পরবর্ত্তী কালে আসে। প্রাচীন বেলুচিস্থান ও সিন্ধুপত্যকার চিত্রকলা এবং পুরাবস্তুর মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশিল্প ও সভ্যতার

অন্যান্য প্রতীক-পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে একদিকে ক্রীত্ ও ইজিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ (Ægean region) এবং অন্যদিকে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়ো এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধের সূত্র বিদ্যমান ছিল ; এবং মেসোপটেমিয়া দেশ খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে সিন্ধু-ক্রীত্-সভ্যতার সন্ধি-স্থান ছিল। দক্ষিণ-ভারতীয় নৌকা-পরীক্ষাদ্বারা শ্রীযুক্ত জেমস্ হর্নেল (James Hornell) স্থির করিয়াছেন[১] যে আদি-দ্রাবিড়-জাতি ভূমধ্যসাগরবাসী জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত ; ইহাদের নৌকার নমুনা মিসর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ভূমধ্যসাগরাঞ্চল হইতে যাযাবররূপে মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। সেখানে কিছু কাল থাকার পর সম্ভবতঃ শেমীয় প্রভৃতি কোন জাতির বিতাড়নে পূর্ব্বমুখে সরিতে সরিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল সিন্ধূপত্যকায় বাস করে। উভয়ের প্রাচীন আচার, ব্যবহার ও ভাষার সাম্য সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। অতঃপর আদি-দ্রাবিড়রা ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতে গিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মৃৎশিল্প, মৃচ্চিত্র ও অন্যান্য পুরাবস্তুতে সিন্ধূপত্যকা ও বেলুচিস্থানের ব্রাহুই-প্রধান স্থান-সমূহের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পক্ষান্তরে দ্রাবিড়জাতি ও ব্রাহুইজাতি এই উভয়ের ভাষাই সংযোগ-মূলক (agglutinative)। মোহেন্-জো-দড়োর লিপি পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ মনে করেন তত্রত্য ভাষাও সংযোগমূলক

১ 'The Origins and Ethnological Significance of Indian Boat Designs,' Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol II, No.13, 1920, pp. 225-26.

(agglutinative) ছিল। এজন্য অনেকের ধারণা যে আদি-দ্রাবিড়দের সঙ্গে মোহেন্-জো-দড়োবাসীর জাতিগত ঐক্য ছিল কিংবা উভয়েই একজাতিভুক্ত। ভূমধ্যসাগরের ক্রীত্‌দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া মেসোপটেমিয়া, এসিয়ামাইনর, সুসা, বেলুচিস্থান, মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা ও আদিত্তনল্লুর দিয়া বর্ত্তমান দ্রাবিড় জাতির মধ্যে পণ্ডিতেরা সমাজ ও কৃষ্টির একটা সামঞ্জস্য বা ঐক্য দেখিতে পান। কেহ কেহ আবার মোহেন্-জো-দড়োর ভাষার সঙ্গে মুণ্ডা ভাষার সামঞ্জস্য থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করেন।[১] ইষ্টার্ আয়্‌ল্যাণ্ডের (Easter Island) অক্ষরের সঙ্গেও এখানকার শতাধিক অক্ষরের মিল আছে।[২] এই উভয়ের ভাষার মধ্যে কি ঐক্য থাকার আশা করা অবাস্তর হইবে? কিন্তু কে কখন এই উভয় লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া জগৎকে নূতন বাণী শুনাইবে? কবে আমরা সেই মোহেন্-জো-দড়ো কিংবা ইষ্টার্ আয়্‌ল্যাণ্ডের প্রিন্সেপ্‌কে[৩] পাইব?

কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাই নগরীর এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রেভারেণ্ড্ হেরাস্ বলিয়াছেন যে, তিনি মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহর পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কয়েকটী দেবদেবীর নাম ও ঐস্থান-সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান দাক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত শিবের কয়েকটী নামের উল্লেখ সিন্ধুলিপিতে

[১] Hunter, "The Script of Harappa and Mohenjodaro," p. 13.

[২] হেভেশি-প্রদর্শিত ইষ্টার্ আয়্‌ল্যাণ্ডের লিপির সহিত সৈন্ধব লিপির সাদৃশ্যবিষয়ে বর্ত্তমানে কেহ কেহ বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। Prof. S. K. Chatterji, 'The Study of New Indo-Aryan.' Jour. Dep. Let. (C. U.), Vol. XXIX, pp. 19-20.

[৩] ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার-কর্ত্তা।

আছে বলিয়া তিনি বলেন। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আরও অনেক নাম বা শব্দের উল্লেখ তিনি এই লেখায় দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াও মত প্রকাশ করেন। যদি তাঁহার পাঠ সত্যই নির্ভুল হয় তবে ঐ যুগের মোহেন্-জো-দড়োর ভাষা যে দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীরই ভাষা ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। তাঁহার গবেষণা সত্য প্রমাণিত হইলে মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীরা দ্রাবিড়-জাতীয় এবং তাহাদের ভাষাও দ্রাবিড়ীয় বলিয়া যে একটা মত আছে তাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু এই সব গবেষণাকে যে কষ্টি পাথরে কষিয়া সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার সন্ধান এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি

ভারতীয় তাম্র-প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ যে সব স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে সিন্ধুতীরবর্ত্তী মোহেন্-জো-দড়োই সর্ব্বপ্রধান। এখানকার সভ্যতার প্রত্যেক দিক্ বা অঙ্গ সুন্দরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নাগরিক এবং সামাজিক জীবনেরও প্রত্যেক অংশ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। পুরাকালে স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে, পূর্ত্তবিদ্যায়, শিল্প ও ললিত-কলায় এবং নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোহেন্-জো-দড়োর জনসাধারণের যে গর্ব্ব করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, সেই কাহিনী তাহাদের পরিত্যক্ত পুরাবস্তুই বহন করিয়া আনিয়াছে। এতদিন ইহারা ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। মোহেন্-জো-দড়োর প্রত্নসম্পদ্ এখন খনিত্রের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ভারতবাসীদের সভ্যতার কথা বিবৃত করিতেছে।

মোহেন্-জো-দড়োর স্থাবর এবং অস্থাবর এই উভয়বিধ পুরাবস্তুতেই সভ্যতার সুনিপুণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেই যে এই সভ্যতার পত্তন, বৃদ্ধি ও পতন হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। কারণ, মোহেন্-জো-দড়োর সর্ব্বনিম্নস্তরে, অর্থাৎ

নগরের আদি অবস্থার সমস্ত দ্রব্যেই যেন একটা সমৃদ্ধ অবস্থার ভাব প্রতিভাত হয়। এই বিকশিত অবস্থার পূর্ব্বে ইহার সৃষ্টি অন্য কোথাও হয়ত হইয়াছিল। অধিকন্তু এইরূপ একটা যুগান্তর-সৃষ্টিকারী সভ্যতার গণ্ডী মোহেন্-জো-দড়োর চতুঃসীমার মধ্যে নিশ্চয়ই নিবদ্ধ ছিল না। ইতিপূর্ব্বে চারিশত মাইল দূরবর্ত্তী হরপ্পা নগরে অনুরূপ সভ্যতার অস্তিত্ব হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার আরও বহু-দূরবিস্তৃত যে একটী আবেষ্টনী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরও যে বহু প্রাচীন ভগ্নস্তূপ সিন্ধুপ্রদেশে বিদ্যমান আছে, সে বিষয় পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু জানা ছিল।

এইগুলির পরীক্ষা-কল্পে একজন বিশেষজ্ঞকে প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অন্যতম সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়কে সিন্ধুপ্রদেশের নানাস্থানে পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া বিবরণ প্রকাশ করিতে নিযুক্ত করেন। তদনুসারে তিনি ১৯২৭-২৮, ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩০-৩১ সালের শীতকালে সিন্ধুদেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তূপ পরীক্ষা করিয়া বিবরণ প্রকাশ করেন।[১] তাঁহার বিবরণ দক্ষতার সহিত লিখিত এবং তিনি যে এ কার্য্যে বর্ত্তমানে যোগ্যতম ব্যক্তি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইহাতে বিদ্যমান। তাঁহার বিবরণী এ দেশে এবং বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়া পুরাতত্ত্বে ভারতীয় কৃতিত্বের নিদর্শন বদ্ধমূল করিয়াছে।

[১] 'Explorations in Sind' by N. G. Majumdar; Memoir No. 48 of Arch. Sur. Ind. 1934.

প্রথম বর্ষে তিনি; মোহেন্-জো-দড়ো হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী ঝুকর (Jhukar) নামক স্থানে ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা ও খনন করিয়া উপরের স্তরে ইন্দো-সাসানীয় যুগের এবং নীচের স্তরে মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত পুরাবস্তুর অনুরূপ দ্রব্য আবিষ্কার করেন।

অতঃপর ১৯২৯-৩০ সালে সিন্ধুসঙ্গমের পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানে প্রায় ২০০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া আনুমানিক শতাধিক প্রাচীন বসতির পরীক্ষা করেন।

১৯৩০-৩১ সালে তিনি সিন্ধুর ধারার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে গিয়া বহু অজ্ঞাত ভগ্নস্তূপের সন্ধান লাভ করেন। ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া ছবি গ্রহণ এবং খনন কার্য্যও পরিচালনা করেন। পর বৎসর পুনরায় সিন্ধুর পূর্ব্ব অঞ্চলস্থিত মরুভূমির নানাস্থানে ঐরূপ পরীক্ষা-কল্পে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গভর্নমেণ্টের অর্থসঙ্কট-হেতু তাহা সম্ভব হয় নাই।

সিন্ধুর অধোদেশস্থিত আম্‌রিতে (Amri) এবং অন্যান্য স্থানে লব্ধ পুরাবস্তু পরীক্ষা করিয়া তিনি ঐ সকল স্থানের সভ্যতা মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়া মনে করেন। এই সব স্থানের মৃৎ-পাত্র চক্র-নির্ম্মিত, মসৃণ ও পাতলা; এইগুলিতে রক্তাভ কিংবা পীতাভ রংয়ের উপর দুই রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর লালের-উপর-কাল চিত্র হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দক্ষিণ-বেলুচিস্থানে স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্‌ও এইরূপ মৃৎ-পাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আম্‌রি-র সভ্যতা মোহেন্-জো-দড়োর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সুরু হইয়াছিল, কারণ উপরের স্তরে মোহেন্-জো-দড়োর মৃৎ-পাত্রের

অনুরূপ লালের-উপর-কাল চিত্র-যুক্ত পাত্র পাওয়া যায়, তাহার নীচের স্তরে আম্‌রি-র বিশিষ্ট পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাজেই বিজ্ঞান-সম্মত স্তরীকরণের (stratification) দ্বারা এই সভ্যতা যে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইহাই প্রমাণিত হয়।

উক্ত প্রকার চিত্রিত পাত্র যে-জাতীয় লোকেরা ব্যবহার করিত, তাহাদের প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহের চিহ্নও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতির সভ্যতা যে অতি উচ্চাঙ্গের ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত জাতির সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ জানার সুবিধা হয় নাই। কারণ এখানে সময় ও ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ মজুমদার মহাশয়ের ছিল না।

কির্‌থার্ পর্ব্বতমালার সন্নিকটে শিলাময় প্রদেশে তিনি দুইটী প্রাচীন বসতির সন্ধান পাইয়াছেন। এই স্থানে গৃহগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল। সিন্ধুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ সহর হইতে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে পর্ব্বোতোপরি কোহ্‌ট্রাস্ বুথী (Kohtras Buthi) নামক স্থানে নগরের বহিস্থিত প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর এবং গৃহের শিলাময় ভিত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে লব্ধ কয়েকখণ্ড খর্পর ও মৃন্ময় পান-পাত্র দেখিয়া মনে হয়, এখানকার অধিবাসীরা মোহেন্-জো-দড়ো-বাসীদের এক জাতীয় বা সমজাতীয় ছিল। ইহার উত্তর দিকে মোহেন্-জো-দড়ো হইতে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে আলীমুরাদ (Ali Murad) নামক স্থানে মোটামুটি ২×১×১ ফুট মাপের প্রস্তর-খণ্ড-দ্বারা নির্ম্মিত প্রাচীর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৭০ ফুট পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে ইহার ৫ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

এখানকার ও কোহ্‌ট্রাসের রঙ্গীন মৃন্ময়-পাত্র এক যুগের বলিয়াই মনে হয়।

হরপ্পা ও মোহেন্‌-জো-দড়োতে এ যাবৎ নগরবেষ্টনকারী প্রাচীরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একজাতীয় সভ্যতায় উদ্ভাসিত আলী-মুরাদ ও কোহ্‌ট্রাসের প্রাচীরের অস্তিত্ব-দ্বারা মোহেন্‌-জো-দড়ো ও হরপ্পায়ও অনুরূপ প্রাচীর হয়ত বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আলী-মুরাদ বেলুচিস্থান-গামী সার্থবাহ-পথের সন্নিকটে অবস্থিত। বেলুচিস্থানের পার্ব্বত্যজাতির আক্রমণের ভয়ে আলী-মুরাদের অধিবাসীদের সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। তজ্জন্য বোধ হয় সেখানে প্রস্তর-নির্ম্মিত এরূপ সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল।

সাধারণতঃ, সিন্ধুপ্রদেশস্থিত বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদ সহরের উত্তর দিকে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক বসতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিকেও মজুমদার মহাশয় তিনটী বসতির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের অন্যতম, 'থাড়ো' (Tharro) নামক স্থানে চক্‌মকি পাথরের অসংখ্য ছুরি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই স্থানে ঐ যুগের চক্‌মকি পাথরের কারখানা ছিল বলিয়া মনে হয়।

মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত অধিকাংশ স্তূপই সিন্ধুনদ এবং বেলুচিস্থানের মধ্যে প্রায় ১৮০ মাইল ব্যাপিয়া একটী বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। সিন্ধুপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত মরু-ভূমির স্থানে স্থানে পরীক্ষা করিলে আরও অধিকসংখ্যক ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সিন্ধুর পূর্ব্ব তীরে "আম্‌রি"র বিপরীত দিকে চান্‌-হু-দড়ো নামক স্থানে অল্প সময়ের পরীক্ষায়ই তিনি মোহেন্‌-জো-দড়োতে লব্ধ শীলমোহর, রঙ্গীন পাত্র, মাটীর

পুতুল ও আকীক পাথরের চিত্রিত মালা প্রভৃতির অনুরূপ পুরাবস্তু আবিষ্কার করেন। ইহাতে তাঁহার ধারণা বদ্ধমূল হয় যে এখানেও মোহেন্-জো-দড়োর সুসভ্য অধিবাসীদেরই কোনও শাখা বা সমজাতীয় লোক বাস করিত। যদিও উভয় স্থানের অধিবাসীরা একজাতীয় সভ্যতারই অন্তর্ভুক্ত তথাপি এখানে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর মৃৎশিল্প দেখিয়া তিনি এই স্থান উভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ম্যাকে-ও তাঁহার এই মতের সমর্থন করেন।[১] সামান্য খননের পরেই এখানে যে চমৎকার রঙীন জালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপ উচ্চাঙ্গের বর্ণবিন্যাস-পূর্ণ দ্রব্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সকল আবিষ্কৃত স্থান বর্ত্তমানে মনুষ্য-বসতি হইতে বহু দূরে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর এই স্থানে পুনরায় কেহ আর বসতি স্থাপন করে নাই। স্যর্ অরেল্ ষ্টাইনের ন্যায় তিনিও মনে করেন, স্থানীয় রুক্ষ আবহাওয়াই এই সকল বসতির অধঃপতনের ও পরিত্যাগের কারণ। তিনি অনুমান করেন, তত্রত্য অধিবাসীরা এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিকে আর্দ্র আব্‌হাওয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ডাঃ ম্যাকে আরও মনে করেন যে ইহারা পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া স্থানীয় দৌর্ব্বল্যকর জলবায়ুর মধ্যে স্বীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে।[২]

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষেও যে হ্রদের মধ্যে মনুষ্য-

[১] Antiquity, March, 1935, p.112.
Mackay, The Indus Civilisation, p 148.

[২] Antiquity, op. cit. p. 112.

বসতি বিদ্যমান ছিল ইহার প্রমাণও মজুমদার মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পরিদর্শনের ফলে মান্‌ছর হ্রদের (Lake Manchhar) চতুর্দ্দিকে জলমগ্ন সৈকতভূমিতে চকমকি পাথরের ছুরি ও রঙ্গীন পাত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তিনি বিভিন্নস্থানে যে সব মৃৎ-শিল্পের উপাদন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

(ক) সর্ব্বপ্রাচীন মৃৎপাত্র। ইহা পাটলবর্ণের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও পাতলা এবং ইহাতে তিন রংয়ের জ্যামিতিক চিত্র থাকিত। আম্‌রি ও সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পাত্রআবিষ্কৃত হইয়াছে। বেলুচিস্থানের "নাল" নামক স্থানের মৃন্ময়-পাত্রের আকৃতির সঙ্গে ইহার কতক সাদৃশ্য আছে। পীতাভধূসর বা ঈষৎ লাল রংয়ের উপর কাল, কৃষ্ণাভ লাল (chocolate) অথবা রক্তিম বাদামী রং বিন্যস্ত করা হইত।

(খ) সুদগ্ধ পুরুপাত্র। ইহাতে মসৃণ লালের উপর কাল রংয়ের নানারূপ চিত্র থাকিত। এইরূপ অতি সুন্দর মৃৎপাত্র চাহ্-নু-দড়োতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে ইহার চেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের চিত্রহীন পাত্র মোহেন্-জো-দড়োতে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) হালকা পাত্র। ইহাতে পীতাভ ধূসর রংয়ের প্রলেপের উপর কাল বা কৃষ্ণাভ লাল (chocolate) রংয়ের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ কোন কোন পাত্রের গলায় রক্তিমপাটল রং থাকিত। ধারাবদ্ধ প্রণালীর (stylised) বৃক্ষ বা পুষ্পই এই সব দ্রব্যের প্রচলিত চিত্র। তিনি এই সব পাত্র ঝুকর ও মোহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সমসাময়িক যুগের বলিয়া মনে করেন।

(ঘ) কৃষ্ণবর্ণ পাত্র। ইহাতে নানারূপ জ্যামিতিক চিত্র ক্ষোদিত ছিল। মান্‌ছর হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী ঝাঙ্গর (Jhangar) নামক স্থানে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের লৌহ-যুগের কাল পাত্রের সঙ্গে এইগুলির তুলনা করিয়াছেন। মোহেন্-জো-দড়োতেও এইজাতীয় পাত্র সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

মজুমদার মহাশয় প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর মৃৎ-পাত্রের মধ্যে কোন ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করেন না। বরং ইহারা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীর সভ্যতার প্রতীক ইহাই তাঁহার ধারণা। প্রথমোক্ত পাত্রের নির্ম্মাতা জাতি বোধহয় বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে এমন কি অতি প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও বাস করিত, কিন্তু পরে দ্বিতীয় প্রণালীর পাত্র-নির্ম্মাতা জাতির নিকট হয়ত পরাস্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এখন এই উভয়ের স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়ার কোন উপায় নাই। দ্বিতীয়োক্ত জাতির মৃন্ময়-পাত্রে বন্য ছাগলের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি মনে করেন, সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিমাংশে ইহাদের আদি বাস ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশের স্থানে স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহু বসতি ছিল; ইহাদের মধ্যে মোহেন্-জো-দড়োর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক যুগের অনেক স্তূপ আছে। আবার ঐগুলির পরীক্ষা-দ্বারা দুই প্রকার সভ্যতার ধারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সব বিবরণ মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মোহেন্-জো-দড়ো সভ্যতার চেয়েও পুরাতন সভ্যতার আংশিক সন্ধান লাভ করা গিয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশ বা বেলুচিস্থানের কোন অংশেই যে এই সভ্যতা জাত হইয়া পরে অন্যান্য স্থানে প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, আপাততঃ আমরা এই ধারণা করিতে পারি।

শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্কফোর্টও (H. Frankfort) তাঁহার পুস্তকে [১] এবং প্রবন্ধে [২] বিভিন্ন দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া বহু গবেষণা-পূর্ব্বক মত প্রকাশ করেন যে মোহেন্-জো-দড়োর তথা ভারতের মৃন্ময়-পাত্রের চিত্রের মূল সূত্র খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে যে ইহা বহু পুরাতন কোন মৃৎপাত্র-রঞ্জন-প্রণালীর পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সিন্ধুতীরবাসীরা স্বকীয় নিপুণতা-দ্বারা ইহাকে নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া লইয়াছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সভ্য দেশের সঙ্গে মোহেন-জো-দড়োর তথা সিন্ধুসভ্যতার যে জীবন্ত আদান-প্রদানের বা সাদৃশ্যের ভাব বিদ্যমান ছিল তাহা আন্তর্জ্জাতিক পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলেই বোধগম্য হয়। মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে সৈন্ধবলিপিযুক্ত ৫।৬টী শীলমোহর এবং সিন্ধুতীরে লব্ধ চিত্রিত আকীক পাথরের মালার অনুরূপ মালা প্রভৃতি যে পাওয়া গিয়াছে, এই বিষয় আমরা অবগত ছিলাম। অধুনা শ্রীযুক্ত গ্যাড্ (C. J. Gadd) উর নগরীতে খননের সময় অন্যূন ১৮টী ভারতীয় শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।[৩]

[১] H. Frankfort, Studies in Ancient Oriental Civilisation, Archæology and the Sumerian Problem, No. 4, Chicago, 1932.

[২] Annual Bibliography of Indian Archæology for 1932. H. Frankfort, The Indus Civilisation and the Near East, pp. 1-12.

[৩] Proceedings of the British Academy, Vol. XVIII, London, 1932.

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ান্তর্গত প্রাচ্যবিদ্যা-বিভাগের (Oriental Institute of the University of Chicago) পক্ষ হইতে ফ্রাঙ্কফোর্ট্ পরিচালিত খনন-কার্য্যে বাগদাদের নিকটবর্ত্তী তল্ আস্‌মের (Tel Asmer) নামক স্থানে ১৯৩২ সালে মোহেন্-জো-দড়োর পুরাবস্তুর অনুরূপ বহু দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়। মেসোপটেমিয়ার এইসব দ্রব্য মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের বলিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট্ মনে করেন। সেখানে লব্ধ একটী নলাকৃতি শীলমোহরে, বাবিলোনিয়াতে নাই এইরূপ ভারতীয় জীবজন্তুর ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যজাতের সঙ্গে এই শীলমোহরও যে সিন্ধুপত্যকা হইতে মেসোপটেমিয়ায় আমদানী হইয়াছিল, এই বিষয়ে ফ্রাঙ্কফোর্টের কোন সন্দেহ নাই। আরও কোন কোন শীলমোহর, আকীক পাথরের চিত্রিত মালা ও মৃন্ময়পাত্র প্রভৃতি দ্বারা সিন্ধুপত্যকা ও তল্-আস্‌মেরের মধ্যে সমজাতীয় সভ্যতার ও চর্য্যাবিষয়ক আদান-প্রদানের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়।

বিবিধ ও সুনিপুণ স্থাপত্য এবং পূর্ত্তকর্ম্মে মোহেন্-জো-দড়োবাসীরা যে সমসাময়িক মিসর ও মেসোপটেমিয়া অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল সে বিষয়েও উক্ত পণ্ডিতের কোন সন্দেহ নাই। এই সকল শিল্পের চর্চ্চা মোহেন্-জো-দড়ো ও মেসোপটেমিয়ায় সময় সময় সমানভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। সিন্ধু-সভ্যতার সময়ে করগুাকার বা ধাপী (corbelled) খিলান প্রচলিত ছিল। তল্-আস্‌মেরেও ইহার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া অধুনা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গোলাকার জল-কূপ, রাস্তার বা গৃহের পয়ঃপ্রণালী এবং উপর তলা

হইতে জল নিকাশের মাটীর নল প্রভৃতিও সমানভাবে উভয় স্থানে বিদ্যমান ছিল।

গৃহের প্রাচীর-মধ্যস্থিত কুলুঙ্গীও (niche) উভয় স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেসোপটেমিয়াতে ইহা গৃহের বাহিরের দিকে এবং মোহেন-জো-দড়োতে ভিতরের দিকে থাকিত। কিন্তু এই বৈপরীত্যপূর্ণ শিল্পের মূলসূত্র হয়ত এক স্থানেই ছিল বলিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট্ মনে করেন।

মাতৃকা-পূজার প্রচলন-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে মেসোপটেমিয়াতেও সুপ্রাচীন কালে ঐরূপ পূজা প্রচলিত ছিল। সেখানে মহামাতৃকাদেবীকে (Great Mother) আর একটী অঙ্গ-দেবতা, অর্থাৎ তাঁহার পুত্র ও প্রিয়তমের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর মাতৃকাপূজার পদ্ধতি পৃথক্ হইলেও অতি প্রাচীন কালে উভয়েই এক সাধারণ ধর্ম্ম হইতে উপজাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সিন্ধুতীরের ও সুমেরের শীলমোহরে অঙ্কিত কিম্ভূত প্রাণি-চিত্র পরীক্ষা করিলেও উভয়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্য-দ্বারা মনে হয় যে, ইহাদের মূলসূত্র একই, কিন্তু স্থানীয় প্রভাবে বিভিন্নরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ওজন, মূর্ত্তি ও অন্যান্য নিদর্শনদ্বারাও তিনি সিন্ধুপত্যকা ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মধ্যে যে এক সাধারণ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সব গবেষণা- দ্বারা ইহা নিশ্চিতই প্রমাণিত হইয়াছে যে মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধুপত্যকা এই উভয় স্থানের সভ্যতার মূলে অতি প্রাচীন একটী উন্নত সভ্যতা ছিল, এবং তাহা হইতে এই উভয় স্থানে উপাদান আহৃত হইয়া দেশ, কাল

ও পাত্রের গুণে নানারূপ সদৃশ ও বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে। উক্ত সভ্যতা, এই উভয় কিংবা আরও অনেক স্থানের শিক্ষা-দীক্ষায়, যবনিকার অন্তরাল হইতে মালমসলা যোগাইতেছে; প্রাচ্য দেশের বহু কেন্দ্রেই ঐ সভ্যতার ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত প্রবাহিত হইতেছে; স্থানে স্থানে ঐগুলিকে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় দেখিয়া ইহাদের ঐক্য-সম্বন্ধে আপাত দৃষ্টিতে আমাদের সন্দেহ হইলেও ইহাদের মূলে যে একটী অবিচ্ছিন্ন ধারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফ্রাঙ্কফোর্ট্ অনুমান করেন, মেসোপটেমিয়ার সর্ব্ব-প্রাচীন অধিবাসীর ইরানীয় (পারস্য) মালভূমি হইতে তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পশ্চিমে গিয়া তাইগ্রীস্ ইউফ্রেটিস্ তীরে বাস করিতে থাকে। স্যর্ অরেল্ ষ্টাইন্ পূর্ব্ব-বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এই অনুমান কতকাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই সকল পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ফ্রাঙ্কফোর্ট্ বলেন যে পারস্য দেশের মালভূমিতে রুক্ষ আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য অধিবাসীদের এক শাখা পশ্চিম দিকে মেসোপটেমিয়া ও অন্য শাখা পূর্ব্বাভিমুখে সিন্ধুপত্যকায় প্রবেশ করিয়া অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ ও অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে বসতি স্থাপন করে। তিনি পারস্য দেশের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার একটা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র দেখিতে পান, কিন্তু সিন্ধুপত্যকার ও পারস্যের মধ্যে কোন অব্যাহত ধারা আবিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; তবে তাঁহার ধারণা পারস্যই এই প্রাচ্য সভ্যতা-সমূহের আদি-জননী ছিল। কিন্তু

এই সিদ্ধান্তের পোষক-স্বরূপ যথেষ্ট উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। পরন্তু পারস্য- ভারত- ও সভ্যতার পরস্পর আদানপ্রদানের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সমস্যা-সমাধানের জন্য সিন্ধ্বুপত্যকার বিভিন্ন স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। স্থানে স্থানে পরীক্ষা-মূলক খাতও খনন করিতে হইবে। পারস্য দেশের প্রাচীন ভগ্নস্তূপগুলি খননের দ্বারাও সিন্ধুসভ্যতায় আলোক-পাত হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদের শক্তির বাহিরে; কাজেই সিন্ধ্বুপত্যকায় মজুমদার মহাশয়ের বর্ণিত স্থানগুলি রীতিমত খনন করিলে প্রাগ্-মোহেন্-জো-দড়ো-যুগের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। ইহা সিন্ধু-পারস্য সভ্যতার মূল কেন্দ্র নির্ণয়ে সাহায্য করিতে পারে।

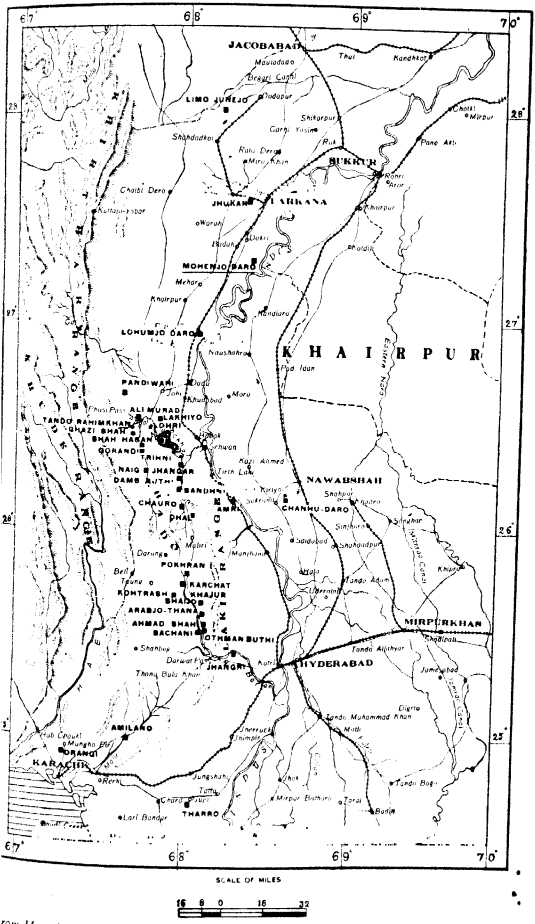
আমাদের মনে হয় গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায়ও সিন্ধ্বুপত্যকার মত যথারীতি পরীক্ষা ও পরীক্ষা-মূলক খাত-খননের দ্বারা যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যতায় নানারূপ কৃষ্টি ও সভ্যতার একটা সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিশ্লেষণ করিলে কতক বৈদিক ও কতক অবৈদিক উপাদান দৃষ্টিগোচর হয়। সিন্ধ্বুপত্যকায় অবৈদিক সভ্যতার চিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দু সভ্যতায় ইহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায়ও বৈদিক কিংবা অবৈদিক অথবা উভয় সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মূলসূত্র এখনও সিন্ধু সভ্যতায় কিংবা বৈদিক সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গঙ্গা-যমুনার তীরবর্ত্তী প্রাচীন স্থানসমূহের পরীক্ষা ও খননের দ্বারা

এই লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। অধিকন্তু ইহা দ্বারা, কি পরিমাণে আর্য্যদের আক্রমণের ফলে ও কি পরিমাণে প্রতিকূল আবহাওয়াবশতঃ ভারতীয় আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল, এই প্রশ্নেরও সুমীমাংসা হওয়া সম্ভব।

শব্দ-সূচী

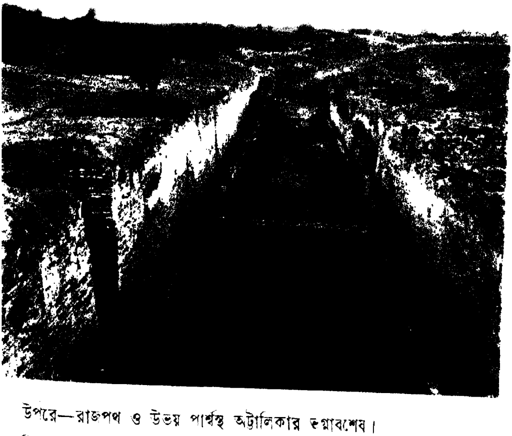
MAP OF SIND

Showing Mohenjodaro and other prehistoric sites.



rom Memoir No. 48 by N. G. Majumdar. *Archæological Survey of India.*





উপরে—রাজপথ ও উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ।

নিম্নে— মধ্যযুগের দ্বিতীয় স্তরের (Intermediate II Period) পথ ও পয়ঃ-প্রণালী।





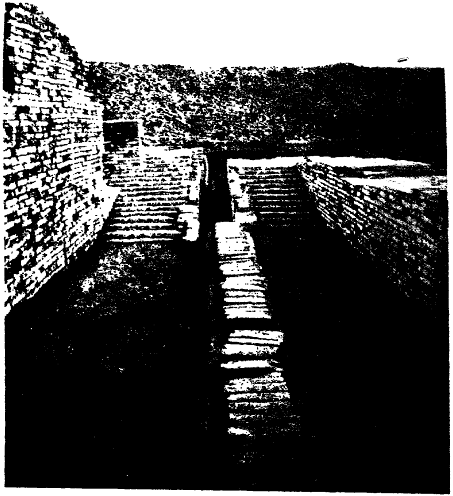
উপরে—শৌচাগার ও ভগ্ন গৃহাদি।

নিম্নে—গৃহ ও তৎসমীপস্থ কূপ ও পয়ঃ-প্রণালী।

opyright Survey



মধ্য যুগের (Intermediate period) সুনির্ম্মিত
পয়ঃ-প্রণালী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গলি।



পয়ঃ-প্রণালী ও উভয় পার্শ্বে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী-যুগের



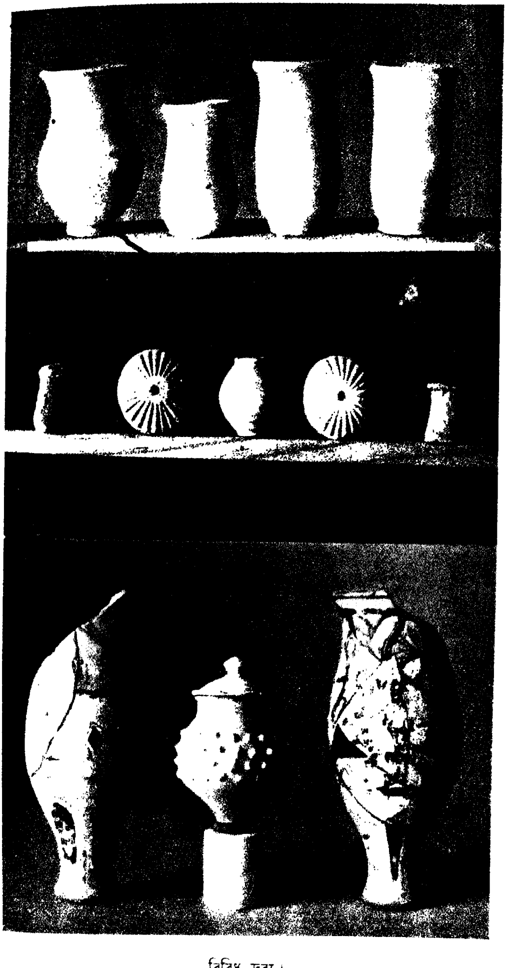
Copyright Archaeologica
Survey of India

ইষ্টক নির্ম্মিত স্নান-বাপী।



চিত্রিত মৃৎ-পাত্র।

Copyright Archaeological Survey of India



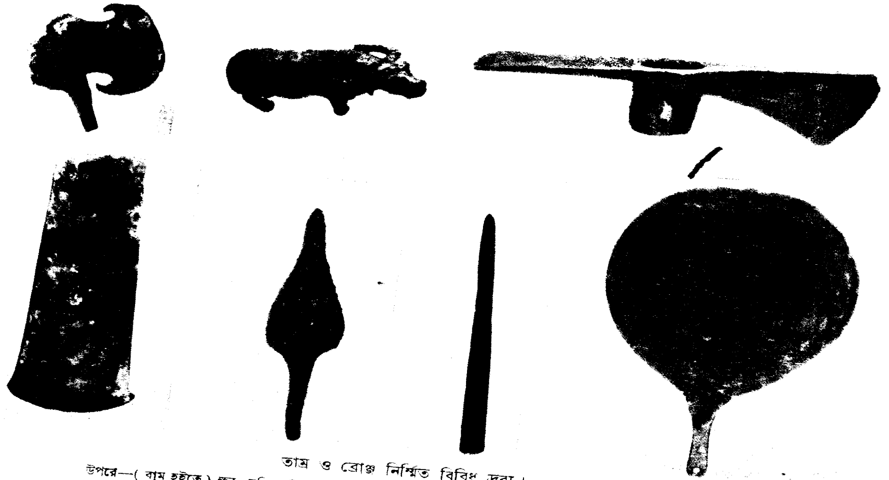
বিবিধ দ্রব্য।

pyright Archæological
Survey of India.

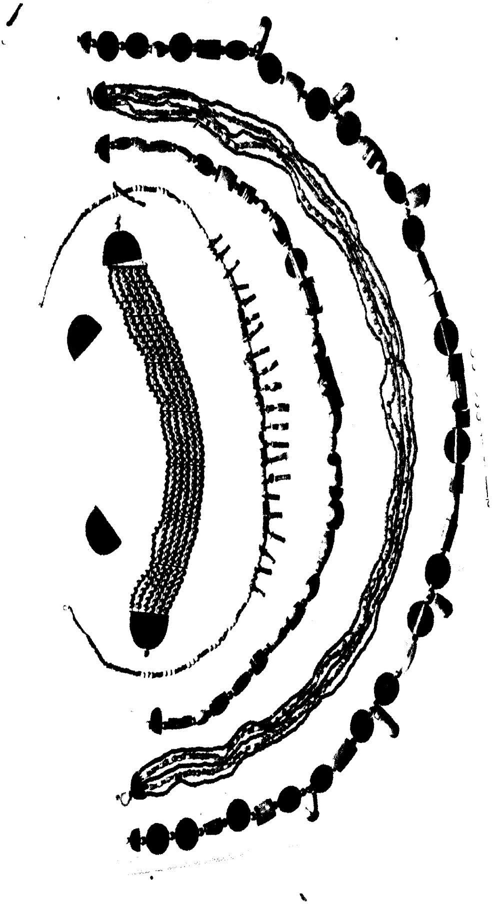


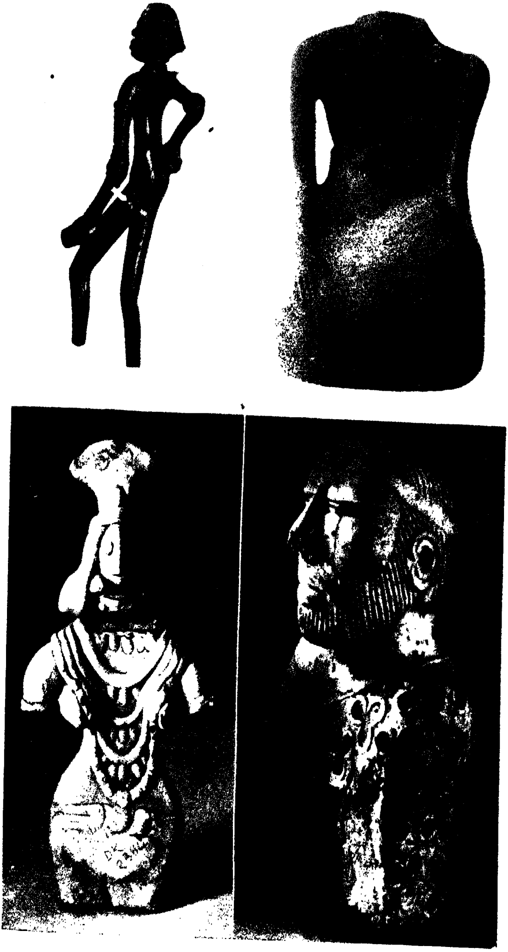
বিভিন্নপ্রকারের শীলমোহর।

Copyright Archaeological



তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য।
উপরে—(বাম হইতে) ক্ষুর, মহিষ, দ্বিমুখ কুঠার। নিম্নে—(বাম হইতে) কুঠার, বর্শার ফলা, বেধনী, দর্পণ।





উপরে—(বাম হইতে) ব্রোঞ্জ নির্মিত নর্তকী মূর্তি মস্তকহীন প্রস্তর মূর্তি।
নিম্নে — (বাম হইতে) পোড়া মাটির স্ত্রী-মূর্তি, নাসাগ্রবদ্ধ-দৃষ্টি প্রস্তরমূর্তি।